শ্রেষ্ঠ
হাসির গল্প

হাসির গল্প

সম্পাদনা

সুজিত নাথ
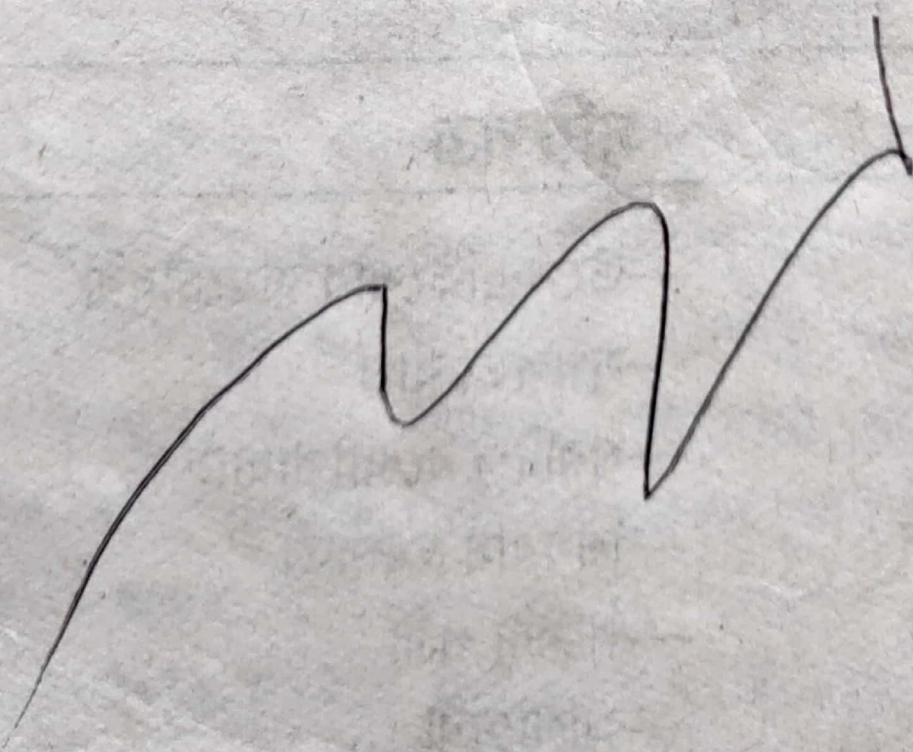
সূচিপত্র

বুদ্ধিমান চাকর

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল তার বাবু ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?' বাবু বললেন, 'শিগগির এস ভজহরি, সর্বনাশ হয়েছে—আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে!' তাতে ভজহরি বলল, 'আপনার কোনও ভয় নেই বাবু, ও মিছে কথা। আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে!'

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতেই তার বাটিটা ভরে গেল। তখন ভজহরি বলল, 'ফাউ দেবে না?' কলু বলল, 'হ্যাঁ দেব বইকি! কিসে করে নেবে?' ভজহরি ভাবল, 'তাই তো কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন!' তখন তার মনে হলো যে বাটির তলায় একটু গর্ত আছে। অমনি সে বাটিটা উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্তটা দেখিয়ে কলুকে বলল, 'এতে ফাউ দাও।' কলু

হাসতে হাসতে সেই গর্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহাখুশি হয়ে তাই নিয়ে বাড়ি এল।

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক, ভজহরি ভাবল নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়! এই ভেবে, সে তাদের পুঁটলি মাথায় করে বসে রইল। বাবু বললেন, 'ভজহরি পুঁটলিটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ?' ভজহরি বললে, 'আজ্ঞে না, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, পুঁটলিটা তাতে রাখলে আরও বোঝাই হয়ে যাবে।'

বাড়িতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, বেটাকে ধরতে হবে। তখন সে মাথায় শিং বেঁধে লেজ পরে উঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরি করতে আসবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল, ভজহরি উঠানের কোণ থেকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ!' চোর ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে এনে একটি পুঁটলি বাঁধল, ভজহরি তাকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ'। তা চোর তাড়াতাড়ি সেই পুঁটলি নিয়ে আঁস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, 'ব্যাটা কি বোকা, আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল, এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে!'

রামধন লোকটি বেশ সাদাসিধে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরেদের বাড়ি চাকরি করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরি করতে গেল, রামধনকেও সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচুবনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই এইখানে চুপ করে বসে থাক্, আমরা চুরি করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।' রামধন বলল, 'আচ্ছা।'

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুলল। বেচারা অনেকক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু'-একটা মারতে লাগল। শেষে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুলল। সেই বাড়ির লোক সব জেগে গিয়ে বলল, 'কে রে তুই এত গোলমাল করছিস?'' রামধন বলল, 'আমি রামধন গো।' বাড়ির লোকেরা বলল, 'ওখানে কি করছিস?' রামধন বলল, 'আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছে!'

তখন তো আর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হলো। ঘরে এসে তারা তারপর

অবিশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বলল, 'কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল; যে ভয়ানক মশা!' চোরেরা বলল, আচ্ছা, খবরদার! আর কখনো এমন করিস নে।'

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরি করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে, মশায় তাকে খেয়ে ফেললেও আর টুঁ শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, রামধনকে বাইরে রেখে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ির কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিটকানি খুলে ফেলল, তারপর রামধনকে বলল, 'এখন তুই চুপি চুপি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র বার করে আন্। দেখিস কোনও শব্দ করিস না যেন।' রামধন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেল। দরজার কব্জায় ছিল মরচে ধরা, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বলল, 'ক্যাঁচ!' রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন তাতে দাঁত খিঁচিয়ে 'আঃ;!' বলে আবার থেমে গেল। তারপর রামধন কিছুতেই আর রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মতো হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ক্যাঁচ্!—ক্যাঁচ!!—কাঁচ্!!!' তারপর কি হলো বুঝতেই পার।

এ-সব তো শুধু গল্প, এবার একটি সত্যিকারের চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যে কেনারাম। কেনারাম সেজেগুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে—তার বাবুর সঙ্গে এক জায়গায় তামাশা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতোর শব্দ এল! কেনারাম বুঝল বাবু বেরুচ্ছেন, এইবেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল—আর ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে।

প্রথমে যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরানো চাকর বলেছিল, 'বাবু কাছারি থেকে এলে রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।' সেদিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পায়খানায় গেলেন, কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানেই গিয়ে তাঁকে বলল, 'বাবু পান এনেছি।'

গাধা গাইল

সুখলতা রাও

একটা গ্রামে একজন ধোপার একটা গাধা ছিল। জোয়ান বয়সে গাধাটা ধোপার জন্য খুবই খেটেছে। কত বড় বড় কাপড়ের মোট বয়ে দিয়েছে, তার শেষ নেই। ধোপাও তখন তাকে খুব পেট ভরে খাইয়েছে, তার আদর-যত্নের কোনও রকম কসুর করেনি। কিন্তু তারপর যখন বেচারা বুড়ো হয়ে পড়ল, তখন দুষ্ট ধোপা তাকে খালি কথায় কথায় মারে, আর খেতে তো এক বেলাও ভাল করে দেয় না।

গাধা বলল 'দূর ছাই! এমন চাকরি আর করব না। এর চেয়ে নিজে রোজগার করা ঢের ভাল।' এই বলে সে ঘাড় দোলাতে দোলাতে পথে বেরিয়ে পড়ল। রোজগার করার কোনও ভাবনা নেই! তার উপায় সে আগেই ভেবে রেখেছে।

রাস্তার ধারে ভুলু কুকুর বসে আসে, মুখখানা ভার। গাধা তাকে বলল, 'কি ভুলু ভাই, বড় যে বেজার দেখছি! ব্যাপারখানা কি?'

ভুলু বলল, 'আর ভাই, এখন বুড়ো হয়েছি আগেকার মতো রাত জেগে পাহারা দিতে পারি না; তাই মুনিব আমাকে বড্ড মেরেছে । আমি এখন ভাবছি পরের চাকরি করব না।'

এ কথা শুনে গাধা বলল, 'আরে ভাই,আমিও সেই মনে করে বেরিয়ে এসেছি। বেশ বেশ; চল দু'জনে শহরে যাই। আমার যেমন দরাজ গলা সেখানে নিশ্চয় একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়তে পারব। তখন তুমি আমার সঙ্গে তবলা বাজাবে।' শুনে কুকুরের ভারী উৎসাহ। সে তখনি গাধার সঙ্গে চলল। যেতে যেতে তারা দেখলে, এক বেড়াল পথের ধারে বসে কাঁদছে

গাধা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কাঁদছ কেন ভাই?' বেড়াল তাতে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলল, কাঁদব না? আমার মতো দশা হলেও তোমরাও কাঁদতে যখন

বয়স ছিল, কত ইঁদুর মেরেছি; আর এখন বুড়োকালে দাঁত পড়ে গিয়ে, আর তেমন ইঁদুর ধরতে পারি না বলে কিনা মুনিব আমাকে ঝাঁটা পেটা করল!'

গাধা আর কুকুর তার পিঠ চাপড়িয়ে বলল, 'তার জন্য কি? এই দেখ, আমরা মুনিবকে জবাব দিয়ে চলে এসেছি। আমরা শহরে গিয়ে যাত্রা দলে ঢুকব, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তোমার যে মিষ্টি গলা, নিশ্চয়ই তারা তোমাকে জুড়ি গান গাইতে দেবে।

তিনজনে মিলে শহরের দিকে যাচ্ছে, শুনতে পেল খানিক আগেই এক বাড়ির চালে একটা মোরগ বসে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। গাধা তাকে ডেকে বলল, 'কি ভাই ঝুঁটিলাল, এত চেঁচাচ্চ কেন?' মোরগ বলল, 'আজ রাত্রে আমাকে দিয়ে কাবাব বানাবে, তাই মনের সাধ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিচ্ছি।' শুনে গাধা কুকুর আর বেড়াল বলল, 'সাধ মিটিয়ে কাজ নেই, তার চেয়ে এইবেলা পালিয়ে এস। আমরা শহরে যাচ্ছি। যাত্রার দলে ঢুকব, আর পরের চাকরি করব না। তুমি আমাদের সঙ্গে এস। তোমার গলাটি আমাদের সকলের চেয়ে সরেস। তোমাকে পেলে তো যাত্রাওয়ালা লুফে নেবে।' মোরগ তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল, বাঃ! আরে তাই তো! চল চল।'

তারা চারজনে মিলে শহরের দিকে চলল। পথে একটা বন পার হতে হবে। তার মাঝামাঝি যেতেই সন্ধ্যা হয়েছে, আর পথ চলে পা-ও ধরেছে ভয়ানক। তাই তারা একটা গাছের নিচে এসে ঠিক করল, সেখানে একটু বিশ্রাম করবে। গাধা আর কুকুর রইল মাটিতে, বেড়াল বসল গাছের উপরে, আর মোরগ উড়ে গিয়ে উঠল একেবারে আগডালে! সেখানে উঠেই সে চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ দূরে একটা বাড়ির আলো জ্বলছে।' শুনে সকলে বলল, 'চল তবে, ওখানেই যাওয়া যাক। হয়ত কিছু খাবার-টাবার জুটতে পারে।'

বলে তারা চারজনে গেল সেই বাড়ির কাছে। তাদের মধ্যে গাধা সকলের চেয়ে ঢ্যাঙা, সে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ঘরের ভিতরে মস্ত ভোজের ধুম লেগেছে, দৈ সন্দেশ লুচির অন্ত নেই। সেটা ছিল চোরদের আড্ডা! আগের দিন রাত্রে তারা চুরি করে ঢের টাকা পেয়েছে, তারই দরুন আজ তাদের ভোজ।

ভোজের নামেই তো চারজনের জিভ দিয়ে জল পড়তে লেগেছে। এমন ভোজটা সামনে, এর কি একটু ভাগ পাওয়া যাবে না? এই লোকগুলোকে খুব একচোট যাত্রা শোনাতে পারলে নিশ্চয় এরা খুশি হয়ে কিছু খেতে দেবে। সবাই সায় দিল, 'বেশ যুক্তি!' তখন গাধা নিজে জানলার উপর দুই পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল; কুকুর চড়ল তার পিঠে। কুকুরের পিঠে উঠল বেড়াল; বেড়ালের মাথায় বসল মোরগ। তারপর তারা চারজনে মিলে প্রাণপণে গান ধরে দিল।

গাধা গাইছে, 'ঘ্যাকো! ঘ্যাকো! ঘ্যাকো! ঘ্যাকো—' কুকুর গাইছে, ' ঘৌ! ঘৌ ঘৌ! ঘৌ! ঔ! ঔ! ঔ! ঔ!—'! বেড়াল গাইছে, 'ওঁয়াও! ওঁয়াও! ওঁয়াও! ওঁয়াও—' মোরগ গাইছে 'কক্, কক্, কক্, কক্, কঁকুর কুঁউউউ—'

সেই বিকট গান শুনে চোরদের প্রাণ উড়ে গেছে। তারা খেতে খেতে উঠে , 'বাবা গো! না জানি কি ভয়ানক জানোয়ার না ভূত!' তখন কোথায় বা রইল পোলাও, কোথায় বা রইল সন্দেশ! মিঠাই-মণ্ডা, কাপড়-চোপড়, টাকাকড়ি সব ফেলে, দে সবাই মিলে চ্যাচাতে চ্যাচাতে বাড়ি ছেড়ে বোঁ বোঁ দৌড়!

গাইয়েরা তা দেখে ভাবল, 'বাঃ এ তো মজা মন্দ নয়!' তারা চারজনে ঘরের ভিতর এসে , পেট ভরে লুচি-পোলাও খেয়ে, বাতি নিবিয়ে সেইখানে শুয়ে রইল।

কুকুর শুল দরজার কাছে, গাধা শুল মেঝেতে, মোরগ উঠল মাচার উপরে, আর বেড়াল শুল উনুনের ধারে ল্যাজ গুটিয়ে।

এদিকে হয়েছে কি, চোরগুলো কিন্তু বেশি দূর যায়নি। সেই বাড়িতে তাদের সব চোরাই মাল রয়েছে, সেগুলোকে ফেলে তারা কি করে যায়! তারা খালি আশেপাশে ঘুরছে। রাত দুপুরে, তাদের একজন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাড়ির ভিতর এল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না; চোর মনে করল, 'উনুনে আগুন আছে জ্বালি।' এই মনে করে, সে একটা দিয়াশালাই কাঠি নিয়ে উনুনের কাছে গেল। অন্ধকারে বেড়ালের চোখ দুটো জ্বলছে, চোর তাই আগুন ভেবে, দিয়েছে তাতে দিয়াশালাই ঢুকিয়ে। আর বেড়ালও তখন দিয়েছে 'ফাঁস' করে তার গালে নখ বসিয়ে। চোর বেচারী তাতে বিষম থতমত খেয়ে, তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে, পড়েছে গাধার ঘাড়ের উপর! আর গাধাও অমনি ধাঁই করে তাকে দিয়েছে ভয়ঙ্কর এক লাথি। লাথির চোটে চোর বেচারা ছিটকে গিয়ে যেই দরজার কাছে পড়েছে, অমনি কুকুর তার গা থেকে এক চাকলা মাংস কামড়িয়ে তুলে নিয়েছে। মোরগটা আবার মাচার উপর থেকে এসব কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ক—ক্ক—ক্ক! ক—ক্ক—কঃ!' চোর তখন 'বাবাগো' মাগো' বলতে বলতে সেখান থেকে দে ছুট!

ফিরে গিয়ে সে অন্য চোরদের বলল, 'বাপরে বাপ্, বাপ্‌রে বাপ! ভূতেরা আমাকে কি মারটাই মেরেছে! খিমচিয়ে, কামড়িয়ে, কিল মেরে আমার কিছু রাখেনি। এমন জানলে কি আর আমি সেখানে যাই? তাদের সর্দারটা আবার ছাতের উপর থেকে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছিল!' এই সব কথা শুনে চোরের দল সেই যে সেখান থেকে পালাল , আর ফিরে এল না।

তখন চার বন্ধুতে মিলে মজাসে সেই বাড়িতে থাকতে লাগল।

স্বামী চপেটানন্দ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালচন্দ্র—ওরফে জেনারেল ন্যাপলার সঙ্গে বোধহয় তোমাদের পরিচয় আছে। একবার সে বুদ্ধি খাটিয়ে মিশন স্কুলের গুণ্ডা ছেলেদের কেমন জব্দ করেছিল, সে গল্প হয়ত পড়ে থাকবে।

নেপাল ছেলেটি দেখতে রোগাপোটকা বটে, আর বয়সও খুব কম, কিন্তু তার মাথায় এতরকম বুদ্ধি আসে যে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাংলার মাস্টার বলাইবাবু তার মাথায় গাঁট্টা মেরে ভারি বিপদে পড়েছিলেন, সেই থেকে কোনও মাস্টার তার গায়ে হাত তুলতেন না।

নেপাল পড়াশোনায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষার সময় কার না ভয় হয়? বিশেষ বলাইবাবু ওৎ পেতে আছেন একটু সুবিধা পেলেই তাকে ফেল করে দেবেন।

বলাইবাবুর ভয়ে নেপাল ভীষণ মনোযোগ দিয়ে বাংলা পড়ছে; কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই—কী জানি কি হয়!

সেদিন বাংলার পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠেই নেপাল সজোরে পড়া মুখস্থ

করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু সুধা এসে হাজির।

সুধা বললে, 'কি রে, আজও পড়া মুখস্থ করছিস?'

নেপাল বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আজ যে বাংলা পরীক্ষা।'

সুধা বললে, 'বাংলা পরীক্ষায় এত ভয় কিসের? তারচেয়ে চল্, কালীতলায় একটা নতুন সাধু এসেছেন তাঁকে দেখে আসি।'

সাধু দেখবার মতো মনের অবস্থা নেপালের ছিল না, সে বলল, 'না ভাই, আজ বলাইবাবু এগজামিনার, আজ যদি একটা ভুল করি তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।'

সুধার নিজের সাধু দেখবার খুব ইচ্ছা, অথচ একলা যেতেও কেমন বাধো বাধো ঠেকে। তাই সে সাধুর বর্ণনা আরম্ভ করলে; বললে, 'কি আশ্চর্য সাধু ভাই! তাঁর নাম স্বামী চপেটানন্দ, ভক্তেরা তাঁকে 'চড়ুবাবাজী' বলে ডাকে। তিনি নাকি যাকে একটি চড় মারেন তার কার্যসিদ্ধি হবেই।'

নেপাল অবাক হয়ে বললে, 'যাঃ! তা কখনো হয়?'

সুধা বললে, 'হ্যাঁরে তাঁর চড়ের নাকি অদ্ভুত গুণ। সমরেশদার ছোট ভাই ক্যাবলার ইয়া বড় পিলে হয়েছিল; চড়ুবাবাজী তাকে একটি চড় মারলেন ব্যাস্, পিলে অমনি ভাল হয়ে গেছে!'

'অ্যাঁ! বলিস কী?'

'হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর ভাল সাধু—যে যা মানস করে যায়, তার তা সিদ্ধ হবেই। স্বামীজীর চড়ের এমনি মহিমা!'

নেপালের মাথায় অমনি বুদ্ধি গজালো। সে ভাবতে ভাবতে বললে, 'আচ্ছা—মনে কর, তিনি যদি আমাকে একটা চড় মারেন তাহলে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব?'

সুধা ভারি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয় পারবি। বলাইবাবু তোকে কিছুতেই ফেল করাতে পারবেন না। তাই চল্ নেপাল, চড়ুবাবাজীর কাছে একটা চড় খেয়ে আসবি—ব্যস্ কেল্লা ফতে! পড়তে হবে না কিছুই, ড্যাং-ড্যাং করে পাশ করে যাবি। আমিও চড় খাব, যা থাকে বরাতে। হিস্ট্রিটা ভাল লিখতে পারিনি—তারিখগুলো আমার একদম মনে থাকে না চল, আর দেরি নয়।'

নেপাল আর লোভ সামলাতে পারলে না। বেরিয়ে পড়ল।

গঙ্গার ধারে কালীতলা। সেখানে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নিচে বাঘের চামড়ার উপর চপেটানন্দ স্বামী বসে আছেন। তখন ভক্তেরাও কেউ এসে জোটেনি।

সুধা আর নেপাল ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলে। বাবাজীর চেহারাটি চিম্‌ড়ে,মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ আছে; চোখ দুটি করমচার মতো লাল। তাঁকে দেখে ভারি তিরিক্তি মেজাজের লোক বলে মনে হয়। তিনি আবার কথা কন না। সব সময় মৌনী হয়ে থাকেন। সুধা আর নেপালকে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

চড়ুইবাবাজীর রুক্ষ চেহারা দেখে নেপালের খুব ভরসা হলো; সে ভাবল— নিশ্চয় ইনি খুব তেজী সন্ন্যাসী! এঁর চড় কখনও বিফল হবে না। হাত জোড় করে সে বললে, 'চড়ুবাবা, আজ আমার বাংলা পরীক্ষা। প্রিপারেশন ভালই করেছি, তবু ভয় হচ্ছে বলাইবাবু আমাকে গোল্লা খাওয়াবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে আমাকে একটি চড় মারেন তো ভাল হয়।

বেশি জোরে মারবেন না প্রভু, আস্তে মারলেই কাজ হবে—'

কিন্তু চড়ুমহারাজ তা শুনবেন কেন! তিনি নেপালের গালে একটি বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলেন। নেপাল একে দুর্বল, তার উপর হঠাৎ এত বড় চড় আশাই করেনি; সে একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। চপেটানন্দ স্বামী চড় মেরেই আবার গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

গালে হাত বুলোতে-বুলোতে নেপাল উঠে বসল। তার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কাউকে কিছু বলবার নেই, সে নিজেই তো চড় খেতে চেয়েছে। সুধা তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে, 'আয় নেপাল তোর কাজ হয়ে গেছে। এবার নিশ্চয় পাশ করবি।'

সুধা নিজে আর চড় খেলে না। বাবাজীর চড়ের বহর দেখেই তার পিলে চমকে গিয়েছিল। সে মনে -মনে ভাবলে—কী হবে চড় খেয়ে? হিস্ট্রি পরীক্ষা তো হয়ে গেছে—এখন চড় খেলে হয়ত কোনও ফলই হবে না, তার চেয়ে নেপাল চড় খেয়েছে এই ভাল হয়েছে।

ভাল কিন্তু মোটেই হয়নি। নেপাল সেদিন বাংলা পরীক্ষা দিলে বটে, কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল বলেই হোক , অথবা যে কারণেই হোক বেচারা পাশ করতে পারলে না। বলাইবাবু তাকে অনেক গোল্লা দিলেন।

এদিকে কী করে জানি না, স্বামী চপেটান্দের কাছে চড় খাওয়ার খবরটা ক্রমে স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই নেপালকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে, কিরে, চড় খেলি তবু পাশ করতে পারলি না! কেউ বললে, আর একটা চড়

খেয়ে আয়, তাহলে তোর মাথায় বুদ্ধি গজাবে। গিরীন বললে, 'ন্যাপলা আমি একটা হনুমান পুষেছি, তুই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোর বুদ্ধি বাড়বে।'

এতদিন বুদ্ধির জন্য সবাই নেপালকে মনে-মনে ভয় করত; তাই এখন বোকা বলবার সুযোগ পেয়ে সকলেই মনের আনন্দে তাকে ক্ষেপাতে শুরু করলে। নেপালের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়; সে ভারি মুষড়ে পড়ল। চড়ুবাবাজী যে একটা ভণ্ড-সন্ন্যাসী তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি সত্যিকার সাধুই হবে, তবে সে ফেল করলে কেন?

কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধার সঙ্গে খেলার মাঠে নেপালের দেখা হলো। নেপাল মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুধা অনেক খোসামোদ করে তার সঙ্গে ভাব করলো। নেপাল বললে, 'তুই-ই যত নষ্টের গোড়া!'

অনুতপ্ত সুধা বলল, আমি তো ভাই জানতুম না! তা—এখন আর রাগ করে লাভ কী বল?

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার চেয়ে, আয়, ঐ ভন্ড-বাবাজীটাকে জব্দ করি।'

চড়ুবাবাজীকে জব্দ করবার জন্য মতলব নেপালের মাথায় ক'দিন থেকেই ঘুরছিল, কিন্তু সে কোনও উপায় ঠিক করতে পারছিল না। দুই বন্ধুতে এখন মাঠে বসে অনেক পরামর্শ করলে। কিন্তু একটিও মনের মতন ফন্দি মাথায় এল না, নেপাল তখন বুকে ঘাড় গুঁজে ভাবতে শুরু করলে।

আধঘণ্টা পরে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'হয়েছে, এবার, বাবাজীকে চড় মারার মজা টের পাইয়ে দেব, হুঁ হুঁ —মহাবীর!'

সুধা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মহাবীর কী?'

নেপাল বললে, 'গিরীনদার মহাবীর। এখন চল, কাল সকালে সব ঠিক হবে। গিরীনদাকেও দলে নিতে হবে।'

পরদিন সকালবেলা স্বামী চপেটানন্দ তাঁর বাঘের চমড়ার উপর শুয়ে ছিলেন আর দু'জন ভক্ত তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় গিরীন, সুধা আর নেপাল গুটি-গুটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। গিরীনের কোলে একটি সাত-আটবছরের ছেলে কিংবা মেয়ে— আগাগোড়া র‍্যাপারে ঢাকা, মনে হয় বুঝি তার ভারি অসুখ করেছে, তাই তাকে চড়ুবাবাজীর চড় খাওয়ার জন্য আনা হয়েছে। এরকম

রোগী বাবাজীর কাছে রোজ দু'চারজন আসে।

তিনজন স্বামীজীকে দণ্ডবৎ করলে। একজন ভক্ত গিরীনের কোলের র‍্যাপার -মূর্তি দেখিয়ে বললে, 'ওর কী হয়েছে?''

নেপাল বিনীত স্বরে বললে, ওর বড় অসুখ; তাই বাবাজীর কাছে নিয়ে এসেছি। উনি যদি দয়া করে একে ভাল করে দেন।'

ভক্ত বললে, 'তা ভাল করে দেবে। ওর কী রোগ হয়েছে?'

নেপাল বললে, 'তা তো জানিনা; কিন্তু ও কথা বলতে পারে না। এখন যদি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দিতে পারেন তো ভাল হয়। আমরা পাঁচ টাকা মানত করেছি। বাবাজীর পায়ে প্রণামী দেব, যদি একে ভাল করে দিতে পারেন।'

প্রণামীর কথা শুনে চপেটানন্দ উঠে বসলেন। ভক্ত বললে, 'এই! এ আর বেশি কথা কী? প্রভু চড় মেরে অনেক বড় বড় রোগ ভাল করেছেন। ওকে কাছে নিয়ে এস।'

'কিন্তু ও বড় রাগী—আর, কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না।'

ভক্ত বললে, 'তাতে ক্ষতি নেই। বাবার চড় খেলেই সব রোগ সেরে যাবে।'

'কথা কইতে পারবে তো?'

'খুব পারবে। দু'দিনের মধ্যেই মুখে খৈ ফুটবে।' গিরীন তখন কোলের রোগীটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর চপেটানন্দ স্বামী মারলেন তার গাল লক্ষ্য করে এক প্রকাণ্ড চড়।

অমনি হুলুস্থুল কাণ্ড!

চড় খেয়ে র‍্যাপারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল— রোগী নয়, প্রকাণ্ড একটা গোদা হনুমান। সে হচ্ছে গিরীনের পোষা হনুমান, তার নাম মহাবীর। মহাবীর ভয়ানক রাগী, গিরীন ছাড়া আর কারুর শাসন মানে না। সে একেবারে চড়ুবাবাজীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। ভক্ত দু'জন 'বাবাগো বলে টেনে দৌড় মারলে।

চড়ুবাবাজীর সঙ্গে মহাবীরের রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। মহাবীরের গায়ে ভীষণ জোর, সে বাবাজীর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বাবাজীর আর মৌনব্রত রইল না, তিনি 'খেলে রে! গেলুম রে! বাবা রে!, বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

মহাবীর কিন্তু ছাড়ে না। সে একে হনুমান, তার উপর চড় খেয়ে বেজায় চটে গিয়েছিল। চিমড়ে চড়ুমহারাজ তাকে সামলাবেন কী করে! সে আঁচড়ে-কামড়ে দাড়ি -গোঁফ ছিঁড়ে— বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় করে তুললে।

নেপাল, গিরীন আর সুধা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আরও অনেক লোক জুটে গেল। নেপাল মাঝে মাঝে বলতে লাগল, 'প্রভু, মহাবীরের মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না!'

প্রভুর তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। তিনি আর কী করেন, শেষে দৌড় দিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। মহাবীর তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

চপেটানন্দ স্বামী সেই যে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে পালালেন, আর ফিরে এলেন না, তিনি যে সত্যিকার সাধু না, একজন ভণ্ড তপস্বী, তা শহরের লোকও ক্রমে বুঝতে পারলে। কারণ দেখা গেল, তিনি যাদের চড় মেরেছিলেন, তারা কেউ সিদ্ধিলাভ করেনি।

ফেল হওয়ার দুঃখ নেপালের একেবারে যায়নি বটে, কিন্তু সে যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে আছে। ইস্কুলে ছেলেরা আর তাকে কেউ ঠাট্টা করে না।
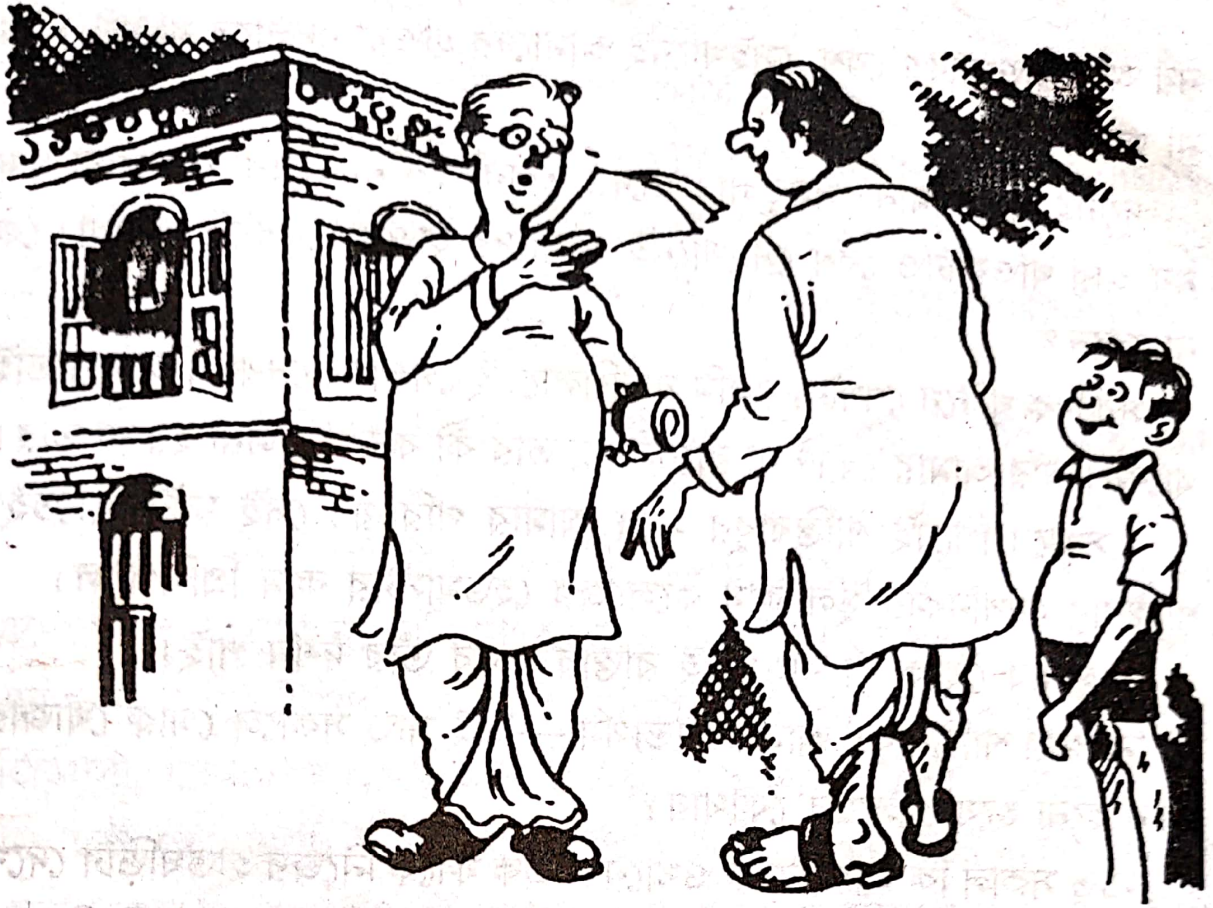
পাশ করতে ধপাস্

শিবরাম চক্রবর্তী

উত্তমরূপে আমায় পরীক্ষার পর ডাক্তার ক। পি রায় বললেন, 'আপনার রোগ তো তেমন কিছু পাচ্ছি না । দেহের কোনও গলতি নেই, তবে মনের যদি কিছু গোল হয়ে তাকে তো কোথাও একটু হাওয়া বদলে আসুন না! দু'দিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।'

'হাওয়া খেয়েই চাঙ্গা হব?

'না না। শুধু হাওয়াতেই কি হয়? খালি হাওয়া খেয়ে হবে কেন? ঐ সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ারও ইতর বিশেষ আছে বই কি!' আমি মেনে নিই তাঁর কথাটা। এমন কিছু বিশেষ ইতর নই যে সেকথা অস্বীকার করব।

'বলাই বাহুল্য।' আমি বলি—'হাওয়া বদল মানেই খাওয়া বদল। সেকথা কি আর বেশি করে বলতে হয়?'

' সেটা আমি বেশ ভাল করেই জানি। কাশী যাই, সেখানে গিয়ে পেয়ারা খাই। পেয়ারা খাবার জন্যই কাশী যাওয়া। আর দেওঘর যাওয়া তার ঐ প্যাঁড়ার জন্যই তো!'

দুটোই প্রায় সমান। সমতুল্য। ওদের তুলনা হয় না। যেখানে খাওয়া মন্দ

নয় আর খাওয়াটাও বেশ, সেইখানেই আমাদের হাওয়া বদলাতে যাওয়া । কে না জানে?

দুটোই প্রায় সমান। সমতুল্য। ওদের তুলনা হয় না। যেখানে খাওয়া মন্দ নয় আর খাওয়াটাও বেশ সেইখানেই আমাদের হাওয়া বদলাতে যাওয়া। কে না জানে?

সব দিক খুঁটিয়ে শেষটায় আমি ঘাটশিলাতেই গেলাম। সেখানে আমার ভাই থাকেন। আর আমার বৌদি যা রাঁধেন না, তার কী বলব! তুলনা হয় না তার।

সেখানে গিয়েই শান্তিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই ঘাটশিলাতেই। শান্তিবাবু সেখানকার স্কুল কাম কলেজের হেডমাস্টার কাম প্রিন্সিপ্যাল।

আস্তানার থেকে পা বাড়াতেই রাস্তার ওপর তাঁর দর্শন পাই।

'নমস্কার শান্তিবাবু!' আমার অভ্যর্থনা—'এই সাত সকালে গোরু খোঁজার মতন হন্যে হয়ে চলেছেন কোথায়?'

'সাত সকাল কি আছে নাকি ওখানে?' এক ফাঁকে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে তিনি কন —'এখন প্রায় সাড়ে দশ! যাব আর কোথায়! চলেছি নিজের গোয়ালে! গোরু কি আমায় খুঁজতে হয়? গোরু সব আমার বাঁধা যেখানে, সেখানেই যাচ্ছি।'

তারপর একটুখানি ঢোক গিলে বললেন—'তবে বলতে হয়, বাঁধা হলেও নেহাত বাধ্য নয়।'

'সে কী কথা!' আমি কই : 'এমন কথা বলবেন না...'

'বলতে হয় না, সে কথা স্বতঃই প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, গোমাতার সন্তান যখন, গোরুতে ওদের ভক্তি আছে বেশ।'

'আর গুরুতে নেই?' আমি শুধোই : 'তা কি হয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস গুরুকেও এরা সমান গোরুত্ব দেয়। গোরুত্ব বা গুরুত্ব যাই কন।'

' সে কথা বলতে ! এই দেখুন না—'

'আপনার বগলে ও কিসের বাণ্ডিল?'

'অ্যানুয়েলে-এর খাতা যত। আজ ক্লাস প্রমোশনের দিন না? সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম...।'

'আমিও তাই জানতে চাইছি..।' তাঁর সঙ্গের ছেলেটিকে দেখি। 'এ ছেলেটি..?'

'আমার গোয়ালের একটি, সকাল থেকে লেজুড়ের মতো লেগে রয়েছে

দেখেছেন?'

'বটে! পাশ করতে পারেনি বুঝি? ' আমি জানতে চাই।

'না।' জবাব পাই শান্তিবাবু—'তা হলে কি ওকে আর আমার কাছে দেখতে পেতেন এতক্ষণ? মাঠে মাঠে গাই চরাতে বেরিয়ে পড়ত কখন!' তিনি কন—'এই দেখুন না, ওর খাতাখানা..... ' বলে তাঁর বাণ্ডিলের থেকে একখানা খাতা আমার হাতে তুলে দেন।

'তাই নাকি?' আমি খাতার পাতাগুলো উলটে যাই —'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি...। '

দেখতে পাই, সত্যিই। ছেলেটি কোনও প্রশ্নের কিছু জবাব দেয়নি। যথোচিত হয়েছে কি না জানি না। প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তরে যথাস্থানে একের পর এক গোরু এঁকে গিয়েছে, এমন কি, যেখানে ইংলিশমে অনুবাদ কর্না—হ্যায় জিজ্ঞাসা, সেখানেও একটি হৃষ্টপুষ্ট গাই এসে হাজির দেখতে পেলাম।

'তাই তো দেখছি।' আমি বলি । 'কিন্তু একী! প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আসল জবাব বাদ দিয়ে ও সব প্রশ্নের আসল জবাব বাদ দিয়ে এ সব কী লিখেছে ছেলেটি! পাতায় পাতায় গোরুর ছড়াছড়ি। '

'তবে আর বলছি কী? বললাম না যে গুরুমোশায়ের চাইতে গুরুভক্তির চেয়ে গোরুভক্তি বেশি এদের? গাইমশাইকে এরা বেশি গুরুত্ব দেয়। গুরুত্ব বা গোরুত্ব—যাই বলুন!'

'তা-ই! পাস করতে গিয়ে ধপাস করেছে সেই জন্যেই।'

জলের মতো সব পরিষ্কার দেখতে পাই। পাই বটে কিন্তু কিছু বলতে চাই না। সাধ করে কে পরের ঝামেলায় মাথা গলায়?

শুধু বলি—কেয়া ভাই? তুমি গুরুমোশর চাইতে ওই গাই মশাইকে (মহাশয় না মহাশয়া কী বলাটা ঠিক হবে?) জাস্‌তি পেয়ার করতা হ্যায়?'

'জরুর।' তার ঘাড় নেড়ে সায় দেওয়া আমার কথায় 'গাই হামারা মাই হ্যায়। '

'বিলকুল ঠিক। লেকিন মাস্টার সাব প্রশ্নপ্রত্রমে হিঁয়া যো হিন্দীসে তুমকো ইংলিশমে অনুবাদ করনেকো দিয়া না?....উও তুম বিলকুল বাদ দে দিয়া।'

বাধ্য হয়ে বাদানুবাদের মধ্যে যেতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও।

'জী।'

'ওহি অনুবাদ তুম বিলকুল বাদ দে দিয়া। এ কেয়া? ইংলিশ ভি হিন্দী সে

কুছ্ সে কুছ কমতি নেহি। বলে আমি যোগ করি আরও—ইংলিশকো জন বুলই কহ যাতা হ্যায়। বুল্ তো ,যাঁড় হ্যায়? উ কেয়া গাইমে কুছ কম যায় গা?'

এই কূট প্রশ্নের জবাবে সে কিছু বলতে পারে না। খানিক চুপ থেকে সে মাথা নাড়ে—'গাই হামারা মাই হ্যায়। ইংলিশ নহী আয়ী হায়।'

'বিলকুল ঠিক।' মাথা নাড়তে হয় আমাকেও। 'কিন্তু ই কেয়া?' প্রশ্নটা শাীন্তিবাবুর দিকে ঘুরিয়ে দিই—'এ কী মশাই? আপনার ছাত্র যে জবাবের জায়গায় কেবল গোরু এঁকে দিয়েছে। গোরুর পর গোরু।'

মেঘের পর মেঘ জমার মতন গোরুর পর গোরু জমেছে। আঁধার দেখতে হয় আমাকে।

'এর মানে কী?'

'ওকে শুধান। ও-ই জানে।'

জবাবে ছেলেটি যেন ছড়ার মতন কাটে;

'গাই হামারা মাতাজী। আংরেজী নেহী আতাজি!'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনিও দেখছি ওর খাতায় কাটেন নি কোথাও। ওর কথাতেই সায় দিয়ে গেছেন মনে হয়।'

'কী করব? স্যর কথা কোথায় যে কাটব? জবাবের জায়গায় তো গোরুই দেখছি কেবল।'

তাঁকে বেশ একটু গরম দেখা যায়—'কী বলেন আপনি? আমি হিন্দু হয়ে তার ওপরে ব্রাহ্মণ সন্তান। তায় ঠাকুর! তাই হয়ে কি গাই কাটব? তাই কম নাকি?

'গাই হামারা মাতা হ্যায়। আংরেজী নেহী আতা হ্যায়।' ছেলেটি জানায়।

'নম্বর না দিন, কথাটার একটা জবাব তো দিতে পারতেন।' বলে—ওঁর হয়ে আমার সদুত্তর বসিয়ে দিতে হয় যথাস্থানে—'বলদ মেরা বাপ হ্যায়। নম্বর দেনা পাপ হ্যায়।'

বড়মামার পাঁচালী

পূর্ণেন্দু পত্রী

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেই মান্তি, আমার বোন, স্কিপিং করার ভঙ্গিতে তিড়িং-বিড়ং লাফিয়ে কোথা থেকে দৌড়ে এসে বললে, জানিস দাদা, সাংঘাতিক সুখবর আছে।

কি?

বড়মামা আসবেন এ বছর পুজোয়।

কে বললে তোকে?

কে বলবে আবার? মাকে চিঠি পাঠিয়েছেন। মা পড়ে শোনাল।

সত্যি? তাহলে তো দারুণ কাটবে রে পুজোর ছুটিটা। মান্তির মতো আমারও করছিল তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে উঠতে। বড়মামা আসবেন মানে, বড়মামার আসা মানে, সত্যি বড়মামা মানে সে যে কী ,তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যাবে না। মহাভারতে না রামায়ণে কোথায় যেন রাজসূয় যজ্ঞের কথা লেখা আছে। বড়মামা মানে সেই রকম হুলস্থূল কাণ্ড।

কলকাতায় যে বছর জাপানিরা বোমা ফেলেছিল, আমি তখনো জন্মাইনি। পরে, বড় হয়ে মায়ের মুখে শুনেছি বড়মামার কাণ্ডকারখানার। শুনি আর

হাসতে হাসতে হাসতে লাউ- কুমড়োর মতো ফুলে ওঠে পেট। অথচ মেন ভুরভুরে হাসির গপ্পো যখন পাড়ার বন্ধুদের বলি, তারা নাক সিটকোয়, চোখ মটকায়। দোলের পিচকারির মতো হাসতে হাসতে বলে, যাক হয়েছে, খুব গুলমারা শিখে এসেছিস কলকাতা থেকে। বড়মামা থাকেন কলকাতায়। আমরা এই পাড়াগাঁয়ে। কালেভদ্রে আমাদের কলকাতায় যাওয়া। দু'চার দিন থেকেই চলে আসা, ঐটুকু থাকাতেই কেউ কখনো কলকাতার গুলমারা শিখে ফেলতে পারে নাকি? আসলে ওরা তো সামনে বড়মামার কাণ্ডকারখানা দেখেনি ওরা তো অবিশ্বাস করবেই।

তখনো জাপানি বোমা পড়েনি। কবে পড়বে কেউ জানে না। কিন্তু একদিন না একদিন পড়বেই, এই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার যে সব মানুষ ছিলেন আমাদের গ্রামের এ বাড়ি ওবাড়ির এ পাড়ার ও পাড়ার আত্মীয়, কলকাতা ছেড়ে সবাই চলে এল সেখানে। তাদের মুখ থেকে ছড়াতে লাগল কলকাতার ভয়ঙ্কর সব গল্প। আর সে সব মায়ের কানে যেতেই মা বুক ভাসাতে লাগলেন চোখের জলে।

আমার বড়দার কী হবে গো! বড়দা কেন চলে আসছে না এখানে! সবাই চলে এল কলকাতা ছেড়ে বড়দা কেন একা পড়ে আছে ঐ শ্মশানে গো! ওগো আমার বড়দার কী হবে গো!

মায়ের এই একটানা কান্নায় নাকানি চুবোনি খেতে খেতে বাবা নাকি শেষ পর্যন্ত পাড়ার সবচেয়ে চৌকস ছেলে হরিদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় বড়মামাকে সপরিবারে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে।

হরিদা গেছে। একদিন যায়, দু'দিন যায়। তিনদিন যায়। পাঁচদিন যায়। সাতদিন যায়, হরিদার ফেরার নামগন্ধ নেই। তাতেই মায়ের ধারণা হয়, জাপানি বোমায় শেষ হয়ে গেছে সবাই। পাড়া-পড়শীরা যত বোঝায়, না গো , এখনো বোমা পড়েনি, কলকাতায় এমন ব্লাক-আউট যে জাপানিরা বুঝতেই পারছে না কোনটা কলকাতা আর কোনটা কোলাঘাট। তাই আকাশে চক্কর মেরে পালিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের একবিন্দু বিশ্বাস নেই সে সব কথায়। আষাঢ়ে বৃষ্টির মতো মায়ের অঝোর কান্নায় ভিজে গিয়ে বাবাকেই অগত্যা ছুটতে হলো একদিন কলকাতায়। মা বারবার করে বলে দিলেন—যদি বেঁচে থাকে, একদণ্ড অপেক্ষা না করে দাদাদের নিয়ে তখনি চলে আসবে।

বাবা গেলেন। একদিন গেল, দুদিন দিল, তিনদিন গেল, পাঁচদিন গেল, বাবার ফেরার নামগন্ধ নেই। ফলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা হতে লাগল মায়ের। এমন সময় একদিন ফিরে এল হরিদা। হরিদাকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে মায়ের তো ডাক ছেড়ে কান্না।

ও হরি, তুই আগে বলতো ওরা সবাই বেঁচে আছে?

হরিদা নাকি তখন পাগলের মতো হাসছিল।

বেঁচে আছে প্রশ্ন করছেন কেন মাসিমা! বেঁচে না থাকলে আপনাদের কাছে পাঠান আমাকে?

আমাদের কাছে তোকে পাঠাবে কী রে? তোকেই তো আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে।

সে তো আপনারা পাঠিয়েছিলেন। এবার ওনারা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে।

আমাদের? বড়দা আমাদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে? আর সেই মানুষটা? মানু-মান্তির বাবা? তারও বুঝি বড়দার মতো মরবার শখ উঠেছে উথলিয়ে?

কী বলছেন মাসিমা? আপনি একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন তো? দেখুন। দেখলেই বুঝতে পারবেন কী কাণ্ড চলেছে বড়মামাদের বাড়িতে।

কান্না থামিয়ে হরিদার দিকে তাকিয়ে তো মায়ের চোখ জুটো কপালে।

ও হরি! তোর এমন দশা হলো কী করে রে? ছাগলের ঠ্যাঙের মতো তোর হাত দুটো হয়ে গেছে যেন হাতির শুঁড়। পেটটা ফুলে হয়ে গেছে জয়ঢাক। কালবোস মাছের গায়ের রঙটা পাল্টিয়ে হয়ে গেছে পাকা রুইয়ের মতো। কী করে এমন হয়ে গেলি তুই?

মাসি গো! তোমাকে যদি সব কথা খুলে বলি তো বিশ্বাস করবে না। ভাববে বানাচ্ছি। আমি তো এখান থেকে গিয়ে পৌঁছলাম মামার বাড়িতে। আর আমাকে পেয়েই অমনি ভরে দিলেন জেলখানায়।

জেলখানা? জেলখানাতো বড়দার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। তোকে সেখানে ভরতে নিয়ে গেল কেন? কী করেছিলি তুই?

সত্যিকারের জেলখানা নাকি ? আদর-যত্নের জেলখানায় । জেলে পুরলে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় না? তা আমাকে ভোগ করতে হলো সেইরকম সশ্রম কারাদণ্ড, বাড়ির যত্নের মানে খাওয়া-দাওয়ার। আমাকে হাতের নাগালে

পেয়েই বড়মামার সে কী কঠিন শাসন, যেই না বলেছি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি আমাদের গ্রামে।

কী বললে? এই রাজসুখের কলকাতা ছেড়ে আমি যাব তোমাদের ঐ এঁদো কাঁকিনাড়ায়? শোনো, এসে পড়েছ যখন, যাওয়ার নামটি করবে না যদ্দিন না যুদ্ধ থামছে। তুমি ফিরে না গেলে এক এক করে বোনজামাই, বোনপো, বোনঝিরা হাজির হবে। তখন সবাই মিলে এখানে শুরু হয়ে যাবে রামরাজত্ব। রুই মাছের সের চার আনা। এক টাকায় দশসের বাসমতী চাল। রসগোল্লা-পান্তুয়া এক আনায় দশটা। এক হাঁড়ি রাবড়ি দু'আনা। তিনতলা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো টাকায়। বিলিতি গাড়ির দাম পঞ্চাশ-ষাট টাকা। তাও কিনবার লোক নেই। এক সের পটল কিনলে এক পো ফাউ দিয়ে দিচ্ছে। এমন রাজসুখের কলকাতাকে ছেড়ে কেউ কখনো পাড়াগাঁয়ে ছোটে? যারা পালাচ্ছে, তারা মূর্খ, গোবেট। আর শোন বাবা হরি, একতলায় দোতলায় দু'জায়গাতেই রান্না হচ্ছে। তোমার যেখানে খুশি খেও। যদি মাসিমার হাতে খেতে ইচ্ছে করে দোতলায় খাবে। যদি রাঁধুনি বামুনের হাতে খেতে ইচ্ছে করে একতলায় খাবে। তবে দোতলায় নিরেমিষ্যি। একতলায় আমিষ।

সে কী রে হরি? দু' জায়গায় রান্না কেন? দাদা-বৌদি কি আলাদা হয়ে গেছে নাকি? সেপারেশন?

না গো মাসি , সেসব কিছু নয়। হিসেব।

হিসেব? কিসের হিসেব?

সাইরেনের।

সাইরেনের সঙ্গে রান্নার কি সম্পর্ক?

সাইরেন বাজলে সবাইকে নেমে আসতে হয় তো নিচে। নিচে সিঁড়ির আড়ালে লুকোতে হয়। তাই।

তার সঙ্গে আমিষ-নিরামিষ দু'রকম রান্না......

শোন মাসি, আমিও গোড়ায় গোড়ায় ভড়কে গিয়ে বোকার মতো জিজ্ঞেস করে ফেলছিলুম এই প্রশ্নটাই। তখন মামাবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন:

কিসে পাশ করেছ? সায়েন্স: না আর্টস?

আমি মাথা নিচু করে বললাম, আট ক্লাস।

ওঃ, তার মানে ক্লাস এইট পর্যন্ত তোমার বিদ্যের দৌড়। তাই বল, সেইজন্যেই এমন সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। রোজ সাইরেন বাজে

কলকাতায় সেটা জান তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতক্ষণ বাজে?

আজ্ঞে মিনিট দশেক বোধ হয়।

জাপানিরা যেদিন সত্যি সত্যি বোমা ফেলতে আসবে কতক্ষণ বাজবে?

আজ্ঞে, আমি কি করে বলব?

তাহলে এর সোজা উত্তরটা শুনে রাখ। জাপানি বিমান কলকাতার আকাশে যতক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াবে, ততক্ষণই বেজে চলবে সাইরেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেটা এক ঘণ্টা হতে পারে, আবার দশ ঘণ্টাও হতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে যেদিন দশ ঘণ্টা সাইরেন বাজবে, আমরা থাকবো কোথায় তখন?

আজ্ঞে সিঁড়ির নিচে।

ঐ দশ ঘণ্টা খাব কী? না খেয়ে থাকা সম্ভব নয় নিশ্চয়?

আজ্ঞে না।

তাহলে প্রত্যেক দিনই দশ ঘণ্টার জন্যে আগাম প্রস্তুত থাকা উচিত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দশ ঘণ্টা ধরে সাইরেন বাজলে মনের আর শরীরের কী ধরণের অবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করার শক্তি নিশ্চয়ই আছে তোমার?

আজ্ঞে-এ-এ-এ।

দুর্বল এবং আতঙ্কগ্রস্থ শরীরে -মনে জোর ফিরিয়ে আনার পক্ষে আমিষ আহারই বেশি উপযোগী তা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না?

আজ্ঞে না।

তাহলে কেন এ বাড়ির দুটো তলায় দু'ধরণের রান্নাঘর এবং দু'ধরনের খাওয়ার ব্যবস্থা তা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তোমার কাছে ক্লিয়ার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লিয়ার।

এই হলো মাসি তোমার দাদার কাণ্ডকারখানা। এবেলা-ওবেলা শুধু খেতে খেতে মানে চব্য চোষ্য লেহ্য-পেয় গিলতে গিলতে আমার এই অবস্থা। তুমি সুক্তোর সজনে ডাঁটার মতো হরিকে পাঠিয়েছিলে কলকাতায়। সে ফিরে এল পটলের দোর্মা হয়ে। তুমি তো আমাকে দেখে চমকাচ্ছ। এবার দেখ,

মেসোমশাই যখন ফিরবেন তাঁকে চিনতে পারো কিনা।

এই হলো আমার বড়মামার গল্প। তবে মায়ের মুখে যা শুনেছিলুম, তাতে আরও খানিকটা আছে। মা বসেছিলেন, তোর বাবা সেই যে। গেল কলকাতায়, তাঁর তো আর ফেরার নামগন্ধ নেই। তারপর একদিন সত্যি সত্যি জাপানি বোমা পড়ল কলকাতায়, আর পড়বি তো পড়, বড়দাদাদের বাড়ির কাছে, জোড়াবাগানে বোমাপড়ার দু'দিন বাদেই বড়দা ছেলেপুলে সবাইকে নিয়ে চলে এলেন আমাদের এখানে। তোর বাবাও চলে এল তাদের সঙ্গে। আমি দূর তেকে দেখছি বড়দার পাশে পাশে রোগা চিমসে মতন যে একটা মানুষ। তাহলে কী তোর বাবা একাই রয়ে গেল কলকাতায়?

তোর বাবার চেহারা ছিল তখন দশাসই পালোয়ানের মতো। আমাদের আটচালার খুঁটির মতো হাত-পা। বুকের ছাতিটা শিবমন্দিরের দরজার মতো। হরির কথা শুনে ভয়ে ভয়ে ভাবছি, হাড়গিলে হরিরই যদি চেহারাটা বদলে গিয়ে থাকে অমন, তাহলে তোর বাবারটা নিশ্চয়ই বড়দার আদর-যত্নের ঠেলায় কোলবালিশের মতো ফুলে উঠবে আরও। সেই মানুষটাই যখন কাছে এসে দাঁড়াল, কার সাধ্যি চেনে? শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে একদম হাড়কঙ্কালসার। দাদাদের সামনে তো আর জিজ্ঞেস করতে পারি না। রাত্রে সবাই ঘুমোলে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি—

হ্যাঁগো, হরি ফিরে এল হাতি হয়ে, তুমি হাতি হয়ে গিয়ে কিনা ফিরে এলে খ্যাংরা কাঠির মতো চেহারা নিয়ে? আহার নিদ্রা-সব ত্যাগ করেছিলে নাকি?

তখন তোর বাবা কী বললে জানিস? বললে,

তোমার ঐ দাদাটি মানুষ নয়, বুঝলে , জাপানি বোমার চেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রতিদিন দু'বেলা কানের কাছে মন্ত্রজপে চলেছেন, আজ বেঁচে আছি, কাল যে বাঁচবে তার কোনও গ্যারাণ্টি নেই ব্রজকিশোর। খেতে কার আপত্তি থাকে বল? তা বলে ঐ রকম? পায়েসের আগে দই । দইয়ের পরে রাবড়ি। রাবড়ির পরে ক্ষীর। রুই মাছের পরে চিংড়ির মালাইকারী। তারপরে মাংসের কোর্মা। তার আগে তোপসে ভাজা। রোজ এভাবে খাওয়া যায় নাকি? খেতে খেতে মানে দু'বেলা ছত্রিশ ব্যঞ্জন খাইয়ে তোমার দাদা আমার সর্বনাশ করে দিয়েছেন মানুর মা। আমি রক্ত আমাশায় ভুগছি।

কাঁঠালীমামা

আশাদেবী

মাথার কাছে একরাশ কাঁঠালের ভূতি আর মুখের চারিদিকে নীল মাছির চক্র যার দেখবেন সেই আমার মামা। মামা লোক খুব ভাল। খান দান নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, কিন্তু কাঁঠাল দেখলেই তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই আমরা তাঁর কাঁঠাল খাওয়ার খ্যাতি শুনতে শুনতে প্রায় মুগ্ধ। কিন্তু সে সব আলোচনা শুধু শোনা আর মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও কাজ নেই। শুধু শুনে শুনেই মামার ওপর আমাদের এমন ভক্তি হয়ে গেল যে আমরা মনে মনে তাঁকে প্রায় পূজো করতে আরম্ভ করলাম। শুধু একজন এসব অন্ধ স্তাবকতার ধার দিয়েই গেল না, সে হলো মামার বাড়ির ভাগলপুরী গরু। হয়তো খাওয়ার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী সে মোটেই সইতে পারে না, হলোই বা মনিব; মনিবের জন্যে তো তার সব চাইতে প্রিয় খাবার ছাড়তে পারে না।

আমরা তাঁকে আদর করে ডাকতাম—কাঁঠালী মামা বলে, কিন্তু কাঁঠালী মামার 'কাঁ' শুনলেই গরু চোখ পাকিয়ে ফোঁস করে প্রতিধ্বনি করতো। মামা উঠতেন চোটে—

কি অকৃতজ্ঞ গরু দেখলি ভজা—!

আমি বলি ওকে বেচে দাও—

কেন রে? মামার বিস্মিত প্রশ্ন—

ওটা পাগল—! আমার সুচিন্তিত মতামত।

বলিস কিরে?

তা নাহলে মনিব চেনে না, যার খাবে তারই দাড়ি উপড়াবে?—

কাঁঠালী মামা রামছাগলের মতো দাড়িতে সযত্নে হাত বোলাতে লাগলো।

কি করি বল তো—? এবার মামা আমারই মতামত চেয়ে বসলেন।

কি আবার করবে বেচে দাও না।

তুই বলিস কি রে, বামুন হয়ে গরু বেচবো! না —না—, তা হয় না, তা হয় না। ওটা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি।

সে কি?

সে অনেক কথা! বাবা মারা গেলন, সম্পত্তি ভাগ নিয়ে আমাদের তিন ভায়ের মধ্যে প্রায় দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু গরু কি করে ভাগ হবে?

কেন ? দাম ধরে নিয়ে—; কথার ওপরেই আমি বলে উঠলাম।

দাম ধরে! কাঁঠালীমামা খাজা-কাঁঠালের ঢেঁকুর তুলে ভেংচে বললে, দামটা তা হলে তুই দিস?

আমি দেব কেন? আমি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলাম ।

কেন মূল্য ধরে বেচলে বামুনের অকল্যাণ হবে আবার গুরু কেটেও ভাগ করা যায় না। তার ওপর যে খাওয়াবে তারই ক্ষতি। খাওয়াবে কে? শেষে সাতদিন ধরে ঠিক হতে হতে গরু না খেয়ে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে গেল। যে ওর কাছে যায় তাকেই কুকুরের মতো কামড়াতে আসে।

ভারি মুশকিল সেখানেই আসান, শেষে ঠিক হলো যার কাছে গরু নিজের ইচ্ছেয় যাবে গরু তারই হবে। কিন্তু ওরা তো জানতো না আসল কায়দা, আমি জানতাম।। আমি এক পেট কাঁঠাল খেয়ে এক গাছতলায় একটু শুয়েছি। হঠাৎ গরুটা আমার দু'ভায়ের মাথার ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে আমার মাথার এক গাছা চুল কামড়ে দিল।

সে কি?

হ্যাঁ তাই , দিল বটে কিন্তু গরু পেয়ে আনন্দে আমায় হাসপাতালে যেতে হলো। টাকে হাত বুলাতে লাগল কাঁঠালীমামা।

তারপর? আমি বললাম।

তারপর আর কি, গরু আমার হলো, কিন্তু হলে কি হবে গরুটা মানুষ না। সব সময়েই মেজাজে থাকে, না দেয় দুধ না শোনে কথা। গরু নিয়ে প্রায় যে-পরিস্থিতিতে পড়েছি!

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। কাঁঠালীমামা বিশটা রুটি আর দুটো আস্ত কাঁঠাল দিয়ে সান্ধ্য-ভোজন সমাধান করে কেবল এসে রকে বসছে।

দাদা আছেন নাকি? যদু মুদী ঘরে ঢুকলো।

মামার মেয়ে খেঁদী বাঁ হাতে নাকের নোলক খুঁটতে খুঁটতে বললে—

বাবা তো বাড়ি নেই।

বলিস কি রে আমি তো এই মাত্র বাড়িতে কথা শুনলাম।

না, কই না তো।

আজ দু'মাস হলো ঘোরাচ্ছে আজ না কাল, কাল না পরশু করে। আজ টাকা না দিলে গলায় গামছা দিয়ে আদায় করব। এই আমি বসলাম বারন্দায়। কতক্ষণ পরে ধোপা, ক্রমে বারান্দা ভরে গেল। লোকের আস্ফালন আর চিৎকারে যত কাকের দল চালে এসে জড়ো হয়ে তারস্বরে কাক কা ধ্বনিতে মুখর করে তুলল। জপ করতে লাগল—কি করা যায়। এরা সবাই দেখেছে মামা ভেতরেই আছে। রোজ রোজ তো আর ফেরাতে পারা যায় না। কঁঠালীমামা ঘনঘন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলো।

অবশেষে কাঁঠালই মামাকে বাঁচালো।—

মামার ছোট মেয়ে খেঁদীকে মামা ডেকে বললেন, দেখ যারা বারান্দায় বসে আছে তাদের প্রত্যেককে এক একটা পাকা কাঁঠাল দে, বল, দেখুন বাড়ির প্রথম ফল বাবা আপনাদের খেতে দিলেন, আপনারা খান, বাবা আসছেন।

বাঃ—বাঃ কাঁঠাল তো, দে রে আর দুটো দে—। বেশ খাজা বলেই মনে হচ্চে। যদু মুদী ভুঁড়িতে হাত বোলাতে লাগলো। ওরে—ও খেঁদী একটা গলা কাঁঠাল-টাঠাল আছে— তো দে না— রে—

ধোবাটা বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গেল গেল করে মামা চেঁচিয়ে উঠলো—রাগী গরুটা কে যেন ছেড়ে দিয়েছে। বাঁধা গরু ছাড়া পেয়ে কাঁঠালের গন্ধে পাগল হয়ে ছুটে আসছে বেয়নের মতো শিং উঁচিয়ে, দেখতে দেখতে বারান্দা খালি—শুধু পাকা কাঁঠালগুলো গরুটা পাগলের মতো থেকে লাগল।

হঠাৎ পট—পটা—পট—

সামনের বেড়া ভেঙে যদু গরুটাকে পাগলের মতো মারতে লাগলো। কিন্তু

সবই ব্যর্থ করে দিয়ে কাঁঠালের মুষলটা মুখে করে গরু সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চোখে জ্বলন্ত জিঘাংসা — তেলের কলের চোহার মতো নাকের বড় বড় ফুটো দুটো দিয়ে ঘন ঘন অগুরুর গন্ধের মতো কাঁঠালের গন্ধ বেরুচ্ছে। এবার প্রায় মুষল পর্ব শুরু হয়ে গেল।

গলির মুখে শিং উঁচিয়ে রাণাকুম্ভের বুঁদিগড় দখল করবার মতো করে দাঁড়িয়ে, দাওয়ায় নজর বন্দী যদু মুদী, ধোবা প্রভৃতি পাওনাদার ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে—

পালাও—পালাও—গরুটা পাগল —খুন করে ফেলবে—। কত লোক যে ও খুন করেছে তার ঠিক নেই, কত লোক জখম হয়েছে —কত লোকের মাথা ফেটেছে—কত লোকের —রেডিওর খবর বলবার মতো করে কাঁঠালীমামা উপরের জানালায় দাঁড়িয়ে—মুখে চোঙা দিয়ে বলতে লাগলেন।

গরুটা কি কথা বোঝে ? চোঙার শব্দে এবার সে এঁড়ে বাছুরের মতো তড়াক—তড়াক—করে নাচতে লাগলো। আর কানের ভেতর কেমন পটাস্-পটাস্ শব্দ হতে লাগলো।

সর্বনাশ! করি কি —যদু প্রায় কেঁদে ফেলল। হঠাৎ ধোবাটা এক কাণ্ড করে বসল। মাথায় দেওয়া ময়লা কাপড়ের বোঁচকাটা ছুঁড়ে মেরে দিল গরুর দিকে— এবার প্রায় কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। এ প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতোই খেলা চলল। যেমন করে 'তিন বাণে কাটলেন অশ্বের চারি হয়' তেমনি করে গোমাতা সেই ময়লা কাপড়ের পুঁটলি শিরে ধারণ করলেন অর্থাৎ বেয়নেটের মতো শিং-এ নৈবিদ্যের মোণ্ডার মতো আটকে রইল। আর সেইভাবে এ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত টেনে আনবার মতো ছুটে আসতে লাগল।

সম্বুজের মতো নিরপেক্ষ দর্শক কাঁঠালীমামা এবার রসের মধ্যে রসগোল্লার মতো ডুব দিলেন।

ওরে—বাঁচাও মামা বাঁচাও, আমি আর টাকা চাই না, আমায় বাঁচাও।

গম্ভীর গলায় মামা বললে, সত্যি বিপদ গেলে নিজমূর্তি ধারণ করবে না?

তোমার পায়ে ধরছি—ছুটে ঘরে গিয়ে যদু মামার পা জড়িয়ে ধরল।

ওরে ভজা, সব দরজা—সব খুলে দে আর গরুটাকে গোটা চারেক কাঁঠাল সামনে দিয়ে দে—তা হলেই শান্ত হবে।

একটা নূতন শাড়ি কিনে দিস ওকে এবার —কাঁঠালীমামা নাকের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে নাকিসুরে স্বগতোক্তি করলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিধু বলত মাট্রিক পাশ করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হব।

বিধু যে মাট্রিকের ফটক পেরুতে পারবে, এত বড় দুরাশার জন্ম অসম্ভব। বিড়ালের কাছে কুকুর যেমন, তার কাছে ইস্কুলের বইগুলোও ছিল তেমনি চক্ষুশূল। দিনরাত পড়ত খালি গোয়েন্দা -কাহিনী।

অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে পড়ে বিধুর এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে ডিটেকটিভ হতে গেলে যা যা জানা দরকার সে-সবের কিছুই আর জানতে বাকি নেই।

বিধু যখন-তখন নাক-মুখ সিটকে বলত— যত হাঁদারাম গিয়ে বাংলাদেশের পুলিশের দলে ভর্তি হয়েছে! চোর -ডাকাত ধরবার আসল ফন্দিই তারা জানে না। শার্লক হোমসের মতো পাকা ডিটেকটিভ এখানে নেই। আমিই হব বাংলা দেশের প্রথম শার্লক হোমস্।

বিধুর মুখে রোজ এমনি কথা শুনে-শুনে ক্রমে আমারও তার বুদ্ধি আর শক্তির উপরে শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল।

যখনি শোনা যেত অমুক জায়গায় খুব বড় চুরি হয়ে গেছে কিন্তু পুলিশ চোর ধরতে পারছে না, বিধু তখন আফসোস করে বলত, ওঃ বাংলাদেশের পুলিশ

কেবল 'ফুলিশ' নয়, বদ্ধ অন্ধও! আমি হলপ্ করে বলতে পারি, ঘটনাস্থলে চোর নিশ্চয়ই কোনও চিহ্ন রেখে গেছে! একটা বোতাম, আঙুলের দাগ, কি একটা পায়ের ছাপ। তাই দেখেই আমি চোর ধরে দিতে পারি! এ-সব মামালার কিনারা করবার জন্যে পুলিশ আমার কাছে আসে না কেন? বিলেতের পুলিশ তো শার্লক হোমস্-এর কাছে আনাগোনা করত!

আমি চমৎকৃত হয়ে বলতুম—ভাই বিধু, এদেশে কেউ তোমাকে চিনতে পারলে না! গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না কিনা! কিন্তু তোমাকে বন্ধু রূপে পেয়ে আমি গর্বিত!

বিধু মুরুব্বিয়ানা চালে বার-দুয়েক আমার পিঠে চাপড়ে দিয়ে বলত— শার্লক হোমসের সঙ্গে ছায়ার মতন থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন। তুমিই হবে আমার ওয়াটসন। আমরা দু'জনে বাংলাদেশের চোর-ডাকাতের বংশ নির্মূল করে ছাড়ব!

আমি বললুম, এ আমার সৌভাগ্য!

সেইদিন থেকেই বিধু আমাকে ওয়াটসন বলে ডাকতে শুরু করলে।

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে হলো এক দুষ্টু চোরের আবির্ভাব।

রাত্রে চোর এসে লোহার সিন্ধুক খোলবার চেষ্টা করছিল। পাশের ঘরে ছিলেন বাবা। হঠাৎ কি শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে গোলমাল করতেই চোর দেয় চম্পট! কিচ্ছু চুরি করতে পারেনি।

বিধু সেই খবর শুনেই উত্তেজিত হয়ে বললে, ওয়াটসন, এই ব্যাপার থেকেই আমাদের ডিটেকটিভ জীবনের পত্তন করা যাক। যে চুরি করতে এসেছিল আমি তাকে ধরে দেব!

সবিস্ময়ে বললুম কেমন করে?

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের বোঝা চাপিয়ে বললে, ডিটেকটিভের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সূত্র আবিষ্কার করা। ঘটনাস্থলে চোর কিছু চিহ্ন রেখে গেছে?

— গেছে। একটা কোট।

— কোট? কোট তো থাকে গায়ে, চোর সেটা ফেলে গেছে কেন?

—কাল রাত্রে কী-রকম গুমোট গরম গেছে জান তো? সিন্দুক খোলবার আগে কাজের সুবিধে হবে বলে, চোর বেটা বোধ হয় কোটটা গা থেকে খুলে রেখেছিল। তারপর তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি কোটটা নিয়ে লম্বা দিতে পারেনি।

আমার পিঠ চাপড়ে বিধু বললে, ওয়াটসন, তোমার আন্দাজ করবার শক্তি দেখে খুশি হলাম! বহুৎ আচ্ছা, নিয়ে এস সেই কোটটা!

এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে কোটটা নিয়ে এলুম। ছোট-ছোট চৌকো ঘর-কাটা

ছিটের কোট।

কোটের পকেট থেকে বেরুল এক প্যাকেট 'পাসিং শো' সিগারেট আর কাগজে-মোড়া খানিকটা দোক্তা। এবং একটা আধলা।

বিধু একটা ফিতে নিয়ে কোটটা খানিকক্ষণ ধরে মাপলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, ওয়াটসন, যে এই কোটের মালিক, সে পান খেতে ভালবাসে, সে বড়লোক নয়, সে দেহে খুব লম্বা-চওড়া।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললুম,কী করে এমন অদ্ভুত আবিষ্কার করলে?

— সে চিনে বাদামও খায়।

—কী আশ্চর্য, কী করে জানলে?

—পকেটে যে দোক্তা নিয়ে বেরোয় সে পানের ভক্ত না হয়ে যায় না। যার সম্বল খালি একটা আধলা আর যে 'পাসিং শো'র মতন কম দামের সিগারেট ব্যবহার করে, নিশ্চয়ই সে বড়লোক নয়। কোটের গলা, ছাতি আর ঝুলের মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটার দেহ খুব লম্বা-চওড়া। পকেটের ভেতরে কতগুলো চিনেবাদামের খোসা পেয়েছি। সুতরাং চোর চিনেবাদামও খায়।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, ধন্য বিধু, ধন্য তোমার বুদ্ধি!

বিধু গর্বিত কণ্ঠে বললে, চোরের চেহারা আর স্বভাব জানা গেল। এখন তাকে গ্রেপ্তার করতে আর বেশি দেরি লাগবে না। বলতে কি, সে তো আমার এই হাতের মুঠোয় —বলেই সে হাত মুঠিবদ্ধ করে তুলে ধরলে।

আমি বিস্ফারিত চোখে রোমাঞ্চিত দেহে বিধুর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে রইলুম—যদিও বুঝতে পারলুম না যে, তার অতটুকু মুঠোর ভিতরে অত বড় একটা চোর বন্দী হবে কেমন করে।

বিধু আবার বললে, ধিক্ এই বাংলাদেশের পুলিশ! এইবারে দেখুক তারা, বুদ্ধি থাকলে কত সহজে টপ্ করে চোর ধরা যায়!

বিধু মুখে আবার বিপুল গাম্ভীর্যের ভাব এনে বললে, ডিটেকটিভের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সতর্ক চোখ খুলে রাখা।

আমি বললুম হ্যাঁ, সর্বদা চোখ খুলে রাখলে চোখে কিছু পড়বেই—অন্তত পোকা-মাকড়টাও।

তারপর কিছুকাল বিধু পথে পথেই দিন কাটায়। আমাকেও দায়ে পড়ে সঙ্গে-সঙ্গেই থাকতে হয়— কারণ আদি শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন, আর আমি হচ্ছি সেই ওয়াটসনেরই মূর্তিমান দ্বিতীয় সংস্করণ। না বলবার জো নেই।

ঘুরে ঘুরে পায়ে পড়েছে যখন ফোস্কা এবং রোদে পুড়ে পুড়ে পায়ের রং হয়েছে তামাটে, তখন হঠাৎ একদিন আমাদের খুলে -রাখা সতর্ক চোখে পড়ল একটি অতিশয় সন্দেহজনক মূর্তি!

বিধু উত্তেজিত আনন্দে একটি লম্ফত্যাগ করে বললে, ওয়াটসন, দেখছ লোকটার চেহারাটা কী-রকম লম্বা-চওড়া?

—হুঁ!

—ওর গায়ের কোটটা দেখ!

— ছোট-ছোট চৌকো ঘর কাটা ছিটের কোট। চোর আমাদের বাড়িতে যে-কোটটা ফেলে গেছে ঠিক যেন তারই জোড়া!

— লোকটা একটা সিগারেটও টানছে। কিন্তু ওটা কী সিগারেট?

—'পাসিং শো' হতে পারে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসবে নাকি?

—ওয়াটসন, তুমি একটি আস্ত এবং মস্ত Ass ! তাহলে ও সন্দেহ করবে যে!...আরে দেখ দেখ, লোকটা কাকে ডাকলে!

—চিনেবাদামওয়ালাকে!

—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে! চল, আমরা ওর পিছু নিই!

পিছু নিলুম। আধঘণ্টা এ-পথে সে-পথে ঘুরে ঘুরে লোকটা একটা পানওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিধু তফাৎ থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, ওয়াটসন, এ কী হলো! ও যে 'গোল্ড-ফ্লেক' সিগারেটের প্যাকেট কিনলে!

—ব্যাটা বোধহয় অন্য কোথাও চুরি করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে পড়েছে!

—ওয়াটসন,তুমি জিনিয়াস! ঠিক ধরেছ! এখন একবার যদি ওর কোটটা হাতে পাই!

—তাহলে কি হবে?

— চোরের কোটের সঙ্গে ওর কোটের মাপ মিললেই তো কেল্লা ফতে!

— সেইটেই তো সমস্যা! লোকটা গুণ্ডার মতন দেখতে। জোর করে কোট দেখতে চাইলে ধাঁ করে মেরেই বসবে!

লোকটা আবার চলতে শুরু করল। আমরাও তার সঙ্গ ছাড়লুম না।

তারপর সে হঠাৎ একখানা বাড়ির ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়িখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিধু বললে, আজ রাত বারোটার সময়ে এইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের জাহাজ নামিয়ে এনে বললে, ডিটেকটিভের তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে , অসীম সাহসে বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করা। ওয়াটসন, নিশ্চয়ই

তুমি ভীতু নও?

রাত বারোটা। আবছা চাঁদের আলোয় আমরা দু'জনে সেই বাড়িখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিক কী স্তব্ধ! পথে নেই জনপ্রাণী।

আমি বললুম, আমার বিশ্বাস আমি ভীতু নই। কী করতে হবে বল।

—বাড়ির গা বেয়ে ঐ যে দেখছ নলটা। ঐটে অবলম্বন করে দোতলায় উঠতে হবে। অবশ্য আমিও উঠব।

প্রস্তাব শুনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হলো। কিন্তু মুখে বললুম, তারপর?

— সেই লোকটা নিশ্চয়ই এখন কোন ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবার আগে কোটটা খুলে রেখেছে। আমাদের সেই কোটটা আবিষ্কার করতে হবে।

—যদি ধরা পড়ি?

—এটা দেখলে কেউ আর আমাদের ধরতে আসবে না। দেখছ এটা কী?

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, কী সর্বনাশ! তুমি কি মানুষ খুন করতে চাও? ওটা যে রিভলবার!

বিধু হেসে বললে, হ্যাঁ নকল রিভলবার। বিলিতি খেলনার দোকানে পাওয়া যায়। এখন এস, আমরা উপরে উঠি।

নল বেয়ে দোতলায় ওঠার হাঙ্গামা আমার মোটেই ভাল লাগল না। একবার হাত ফস্কালেই হয় হাসপাতাল, নয় নিমতলাঘাটে যাত্রা করতে হবে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। ওয়াটসন হওয়ার এত বিপদ, তা জানতুম না। মনে-মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু তবু ছাড়ান নেই, শেষ পর্যন্ত উঠতে হলো।

ফাঁড়ার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। জ্যান্ত অবস্থাতেই ছাদের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ শুনতে পেলুম স্পষ্ট।

একহাতে 'টর্চ', আর একহাতে নকল-রিভলবার নিয়ে বিধু চুপিচুপি বললে, ঐদিকে সিঁড়ি রয়েছে। পা টিপে-টিপে আমার সঙ্গে নেমে এস।

পা টিপে -টিপেই অগ্রসর হলুম বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল আমার বুকের দুপদুপুনির শব্দে সারা পাড়া এখনি জেগে উঠবে। মনে মনে বললুম, হে মা কালী, হে মা দুর্গা! এ-যাত্রা যদি মানে -মানে আমাকে রক্ষা কর, তাহলে আমি আর কখনো ওয়াটসন হবার চেষ্টা করব না!

কিন্তু আমার কাতর প্রার্থনা মা-কালী বা মা-দুর্গার কাছে পৌঁছবার আগেই বারান্দার ওধারের অন্ধকারের ভিতর থেকে গর্জন করে কে বলে উঠল—কে রে! কে রে! কে রে! তারপরেই অতি দ্রুত পায়ের শব্দ।

বারান্দার এপাশ হাতড়ে বিধু তৎক্ষণাৎ একটা দরজা আবিষ্কার করে ফেললে

এবং চোখের পলক পড়বার আগেই আমাকে টেনে নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

বিধু বললে, ডিটেকটিভের চতুর্থ কর্তব্য হচ্ছে উপস্থিত-বুদ্ধি খাটাতে পারা। ভাগ্যিস আমি উপস্থিত -বুদ্ধি হারাইনি, নইলে এতক্ষণে ওরা আমাদের ধরে ফেলত!

হঠাৎ সুইচ-টেপার শব্দ , সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যেন তীব্র আলোর ঝড় খেলে গেল!

এক মুহূর্ত অন্ধের মতো থেকে যখন আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলুম তখন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম যে, খাটের উপরে বিস্ময়ে বসে আছেন আমাদেরই ইস্কুলের হেড পণ্ডিতমশাই!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—এও কি সম্ভব? আমাদের ইস্কুলের সদাই-খাপ্পা হেডপন্ডিতমশাই, ভয়ঙ্কর খোট্টাই-গাঁট্টার আবিষ্কারক রূপে ছেলে-মহলে যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত ,আমরা কি আজ অজান্তে তাঁরই বাড়িতে , তাঁরই শয়নগৃহে এসে পড়েছি ? একেবারে বাঘের মুখে! ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে আমার মূর্ছার উপক্রম হলো!

ওদিকে বাহির থেকে ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল এবং সেই সঙ্গে চিৎকার শোনা গেল— চোর! চোর! দাদা, তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!

এ আবার কী হলো, চোরের খোঁজে এসে নিজেরাই চোর বলে ধরা পড়ব নাকি?

হেডপণ্ডিত শুধোলেন—কে রে? প্রেমলাল না? আরে বিধুভূষণও যে! ব্যাপার কী হে! তোমরা স্বদেশী ডাকাত হয়েছ নাকি?

ধন্য বিধু, তখনো উপস্থিত-বুদ্ধি হারাতে রাজি হলো না । সে মুখে হাসি আনবার মিথ্যে চেষ্টা করে বললে, আজ্ঞে না স্যার, আমরা স্বদেশী ডাকাত নই—আমরা হচ্ছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ? বটে, বটে, তাই রাত বারোটার সময় চোরের মতো ঢুকেছ আমার বাড়িতে? ওদিকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ আমার ঘরে? আমাকে ন্যাকা পেয়েছ, না? আচ্ছা দাঁড়াও!—পণ্ডিত মশাই খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে বেগে তেড়ে এসে বিধু ডিটেকটিভের মাথায় 'হঠাৎ' করে বসিয়ে দিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ খোট্টাই-গাঁট্টা।

ইতিমধ্যে আমার ভীত ও ব্যস্ত চোখে পড়ল, ঘরের একটা জানালায় একটা গরাদ নেই। পণ্ডিত মশায়ের দ্বিতীয় গাঁট্টা বিধুর মাথায় অবতীর্ণ হবার আগেই

সেই ভাঙা জানালা দিয়ে রাস্তায় ঝাঁপ খেলুম। হাতে-পায়ে যথেষ্ট চোট লাগল বটে, কিন্তু সুবিখ্যাত খোট্টাই-গাঁট্টার তুলনায় সে-সব আঘাত কিছুই নয়।

পরদিন সকালে বিধু ম্লানমুখে এসে দেখালে, গাঁট্টার চোটে তার মায়ার এগারো জায়গা ফুলে ঢিবি হয়ে উঠছে।

খোট্টাই-গাঁট্টার কীর্তি-দর্শন যখন শেষ হলো, বিধু অভিমান ভরে বললে, ওয়াটসন, তুমি যে এমন কাপুরুষ আমি তা জানতুম না! আমাকে যমের মুখে ফেলে অনায়াসে চম্পট দিলে?

দুঃখিত স্বরে বললুম, পালিয়ে আর এলুম কোথায় ভাই, যমের মুখ থেকে কি পালিয়ে আসা যায়? ইস্কুলে গেলেই টের পাবে, খোট্টাই-গাঁট্টা আমারও জন্যে বিপুল বিক্রমে অপেক্ষা করছে!

বিধু মাথা নেড়ে বললে, না, তোমার আর ভয় নেই। তুমি হচ্ছ মাত্র ওয়াটসন আর আমি হচ্ছি বাংলার শার্লক হোমস— তোমার চেয়ে ঢের বড়, আর বড় গাছই ঝড়ে পড়ে।

বিধুর জাঁক আজ আর ভাল লাগল না। বিরক্ত ভাবে বললুম, তার মানে?

বিধু বললে, সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়েই বয়ে গেছে, তোমার আর কোনও ভয় নেই।

—তাই নাকি? গাঁট্টা-বৃষ্টি যখন থামল তুমি তখন কী করলে?

আমি পণ্ডিতমশাইকে সব কথা খুলে বললাম, শুনে তিনি পাঁচ মিনিট ধরে হো হো হো করে হেসে বললেন, এ-সব কথা জানলে আমি তোমাকে এত জোরে অতগুলো গাঁট্টা মারতুম না। তাঁর ঘরে রসগোল্লা ছিল, আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছেড়ে দিলেন।

—আমরা যার পিছু নিয়েছিলুম, সে লোকটা কে?

—পণ্ডিতমশাইয়ের ভাই। আমাদের বড়ই ভুল হয়ে গেছে, আবার দেখছি গোড়া থেকে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে।—ডিটেকটিভের পঞ্চম কর্তব্য হচ্ছে—

বাধা দিয়ে বললুম, তোমার ও ডিটেকটিভের কর্তব্যের তালিকা রেখে দাও! মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, নিজের প্রাণ বাঁচানো। আমি তোমার দলে নেই।

— কে ওয়াটসন? আমার নাম প্রেমলাল মিত্র। নিজের নাম আর কখনো আমি ভুলব না।

কখন কি যে হয়

আশাপূর্ণা দেবী

'এই লোককে নিয়ে এলি তুই বাসন মাজাতে?'

ভুনি পিসি দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলেন, 'বিশ্ব-ভুবনে আর লোক খুঁজে পেলি না খোকনা? এই পুঁয়ে পাওয়া হাড়গিলে পীলেপেট কোটর চক্ষু চামচিকেটা, তোদের গুষ্ঠির বাসন মাজবে?'

' খোকনা' মানে অবশ্য কোন শিশু নয়।

ভুনি পিসির ভাইপো হলেও, তিনি তাঁর নিজের ভাইপোদের 'জ্যাঠামশাই'। তাছাড়া তিনি তাঁর জামাইয়ের শ্বশুর, ছেলেমেয়েদের পূজনীয় পিতা এবং মস্ত বড় অফিসটার একেবারে হেড বড়বাবু। যেখানে তাঁর নাম হচ্ছে পি. বি. চৌধুরী।

অর্থাৎ কিনা প্রভাত ভূষণ চৌধুরী!

ভদ্দর লোকের বুদ্ধি-সুদ্ধি ভালই ছিলো, কিন্তু এবারে যে কী দুর্মতি ধরলো, পূজোর ছুটিতে গুটিশুদ্ধ সকলকে নিয়ে বেড়াতে এলেন জামতাড়ায়!

আর সকলের গার্জেন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এলেন ভুনি পিসিকে।

ভুনি পিসি ভুনি খিচুড়ি ভাল রাঁধেন বলেই যে তাঁর এই নামকরণ নয়, নামকরণের সময় তিনি বোধহয় খিচুড়ি -টিচুড়ি রাঁধতে তেমন শেখেনওনি, আসলে 'ভুবনমোহিনী'র অপভ্রংশ হচ্ছে গিয়ে 'ভুনি'।

সে যাক —প্রথমটা এসেই ভুনি পিসির ভুনি খিচুড়ি, আর বাড়িওয়ালার বাগানের মালির হাতের মুরগি, এই দুটোর যোগফলে বড় আনন্দেই কেটেছিল সবাইয়ের। মানে পি. বি. চৌধুরী বা প্রভাত ভূষণের ছেলে-মেয়েরা, বৌ, শালি, জামাই, বেয়াই, ভাই, ভাই-বৌ, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, ইত্যাদি প্রভৃতি সবাইয়ের।

কিন্তু মুস্কিল হলো—কলকাতা থেকে যে চাকর নিয়ে আসা হয়েছিল, সে হঠাৎ একা রাতে উঠোনের নিমগাছে ভূত দেখে, সেই যে আঁ-আঁ-আঁ শব্দে হাঁ করে চেঁচালো, সে হাঁ বুজলো একেবারে কলকাতায় গিয়ে। তারপর সেই জীবন রতনের দেখাদেখি বাড়ির ছোট ছেলেরাও কিছুদিন 'ভূত' দেখতে শুরু করেছিল, কিন্তু ভুনি পিসি বকুনির চোটে তাদের ভূত ছাড়িয়ে ছাড়লেন।

ভুনি পিসি এই বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ব্যাপারই ম্যানেজ করে ফেলছেন, কিন্তু মুস্কিল বাধলো ওই চাকরের ব্যাপারটায়।

জামতাড়ায় যে বাসন মাজার লোকের এতো অভাব, তা কে জানতো?

প্রভাত ভূষণ আর তাঁর ভাই প্রকাশ ভূষণ, আর বড় ভাইপো প্রচণ্ড ভূষণ, এই ত্রিশক্তি সম্মেলনের কর্মপ্রচেষ্টা কোনও কাজে লাগছে না। চাকর জোগাড় হচ্ছে না।

ঝিও না।

সকালে, বিকেলে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, এক একজনকে ধরে আনছেন ওঁরা, তারা এসেই প্রথম প্রশ্ন করছে, 'ক'জন লোক?'

যেই শুনেছে 'পঁচিশজন,' সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যাবাউট টার্ন'। চলে যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, 'অত বাসন মাজতে পারবনি।'

এখন উপায়?

বাড়ির লোক যদি বাসনই মাজতে বসবে, তো বেড়াতে যাবে কখন? আর বেড়াতেই যদি সময় না পাবে, তো কলকাতার বাড়ির আরাম-আয়েস ছেড়ে এখানে থাকারই বা দরকার কী? চলে গেলেও হয়! আর চলেই যদি যেতে হয়, তাহলে এতো জামা কাপড় ট্রাঙ্ক-সুটকেস, তাস-ক্যারাম, গ্রামোফোন হারমোনিয়াম, তবলা-ঘুঙুর, হাঁড়ি-কড়া, বিছানা-বালিশ, আনাই বা হলো কেন?

বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখে শুধু এই 'কেন' 'কেন' রব।

অথচ এই সমস্ত 'কেন'র সমাধান হয়ে যায় একটি চাকর জোটাতে পারলেই।

সময় সময় যে সামান্য একটা চাকরও এতো দামী হয়ে উঠতে পারে, একথা আগে কোনওদিন টের পাননি পি. বি।

কিন্তু চেষ্টা ছাড়লে তো চলবে না?

চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তার ফলেই আজকের ওই পুঁয়ে পাওয়া হাড়গিলে পীলেপেটা চামচিকের আগমন। ধরে এনেছেন পি. বি। কোথা থেকে কে জানে।

এর আগেও অবশ্য একজন উড়ে চাকরকে ধরে এনেছিলেন। তার হাবভাব, , কথাবার্তা আর হাত নাড়ানো দেখে ভুনি পিসি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদেয় করলেন।

এতোদিন পি. বি. একরকম নিশ্চিন্ত হচ্ছিলেন, এবার একটা লোককে টেঁকাতে পারা যাবে। ছোকরা পালাবে না। কারণ পালাবার জায়গা নেই তার। কিন্তু বিপদ যে অন্য দিক থেকেও আসতে পারে, তা ভাবেননি।

এখন দেখতেই পেয়ে গেলেন।

তবু পি. বি. কাতর গলায় বললেন, না খেতে পেয়ে পেয়েই ছেলেটার এই হাল হয়েছে ভুনি পিসি, দু'দিন পেট ভরে খেতে পেলেই আর চামচিকে থাকবে না।

ভুনি পিসি এখন আঁচলাটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বলেন, 'থাকবে না? দু'দিন ভাত খেলেই চামচিকে হাতি হয়ে যাবে? বেহ্মদত্যির কাছে মামদোবাজি দেখাতে আসিসনি খোকনা! এই আমি বলে দিচ্ছি খোকনা, পাত্রপাঠ বিদেয় কর ওকে। দেখতে পাচ্ছিস এই সন্ধেবেলা এখনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে! ও করবে কাজ?'

ছেলেটা এতোক্ষণ হাঁ করে ভুনি পিসির মুখের দিকে তাকিয়েছিল, সেই হাঁ-টাই বোধ হয় একবার বুজে ফেলেছে, ভুনি পিসির চোখে সেটা হাই-তে দাঁড়িয়েছে। হাঁ-টা বুজল এই জন্যে ভুনি পিসির এতো কথার মধ্যে একটি মাত্র কথাই সে বুঝতে পেরেছে। সেটা হচ্ছে ওই হাইতোলা।

অতএব ও এই কথাটার উত্তর দিয়ে ফেলে চটপট।

'এজ্ঞে হাই তো তুলিনি গিন্নিমা! হাঁ বুজলাম।'

ভুনি পিসি রেগে উঠে বলেন, 'আরে গেল যা, এটা আবার কী ফোড়ন কাটতে এলো! খোকনা, বুঝতে পারছিস এ ছোঁড়ার প্রকৃতি ভাল হবে না। আমাদের

কথার মধ্যে ফোড়ন কাটবে। বিদেয় কর, বিদেয় কর।'

ছেলেটা ভয়ে চুপসে গেল।

ভুনি পিসির দিকে তাকাতেও সাহস করলো না আর।

খোকনা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, 'তা হলে আর কী করা? ওরে বাপু, চাকরি ফাকরি তোর আর হলো না। যা যেখানে বসে কাঁদছিলি, কাঁদগে যা।'

ভুনি পিসি কোমর থেকে হাতটা নামিয়ে ছিলেন, আবার কোমরে তুলে যাকে বলে 'অগ্নিগর্ভ' -কণ্ঠ। তেমনি কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী বললি খোকনা, যেখানে বসে কাঁদছিল? অ্যাঁ। তার মানে এটা ছিঁচ-কাঁদুনে কচি খোকা? আর সেই খোকাকে, তুই বাসন মাজাতে নিয়ে এসেছিস! বুদ্ধির বলিহারী যাই তোর খোকনা! বিদেয় কর, বিদেয় কর।'

পি. বি. গম্ভীরভাবে বলেন, 'তাই তো করছি। যা-রে গোবিন্দ, তোর ভাগ্যে আর আমার পিসির হাতের ভুনি খিচুড়ি খাওয়া হলো না।'

'খিচুড়ির কথা কী বলছিস রে খোকনা?'

'না, এই রাস্তায় আসতে আসতে ছোঁড়াকে তোমার হাতের রান্নার কথা বলছিলাম। বলছিল কিনা 'তিনদিন খায়নি,' তাই বলছিলাম—'চল্ ঠাকুরমার হাতে ভুনি খিচুড়ি খাবি, খেলে তোর আর—

'কী বললি খোকনা? ঠাকুমা! তার মানে ওই চামচিকেটা আমার নাতি! ভাল চাস তো এক্ষুণি দূর কর ওকে। বাড়িতে ঢোকালে রক্ষে আছে? হয়তো ন্যাবনচুষ দাও, বিস্কুট খাবো বলে বায়না করবে। এই উঠোন থেকেই ভাগা'।

পি. বি. এবার চটে উঠে বলেন, 'তাই তো ভাগাচ্ছি। চলে আয়। শুধু শুধু কষ্ট দিলাম তোকে।'

ছেলেটার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে পি. বি. এগোল।

কিন্তু একটা পা ফেলে আর একটা পা তোলবার আগেই ভুনি পিসি জলদগম্ভীর গলায় বলে ওঠেন, ' খোকনা! আক্কেল কি তোর কোনও কালে হবে না, বলি এই রাতের অন্ধকারে তুই যে ওই একটা চিমড়ে মড়াখেগো এক ফোঁটা ছেলেকে বাড়ির বাইরে বার করে দিচ্ছিস, ও যাবে কী করে সেটা ভাবছিস?'

পি. বি. হতভম্ব হয়ে বলেন, 'তা তুমি তো বললে—'

ভুনি পিসি কোমরে হাত দিয়ে প্রায় এক পাক নেচে নিয়ে বলেন, 'আমিই যে বললাম?..... বলি খোকনা, আমি যদি তোকে কারুর ঘরে আগুন লাগাতে বলি, লাগাবি তাই? যদি কারুর সিন্দুক ভাঙতে বলি ভাঙবি?'

পি. বি-র গোঁফের মধ্যে একটু হাসির আভাস খেলে। বলেন, 'তাহলে থেকে যা গোবিন্দ! চাকরিটা তো হয়েই গেল।'

ভুনি পিসি হঠাৎ পুতুলের মতো ছিটকে উঠে বলে ওঠেন, 'অ্যাঁ। চাকরিটা অমনি হয়ে গেল? তার মানে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে ও এখন তোদের বাসনের পাহাড় নিয়ে মাজতে বসবে! খবরদার বলছি তোকে ছোঁড়া, বাসনে হাত দিতে যাবি না।...খিচুড়ি রান্না হয়েছে ঢেলে দিচ্ছি, গিলে নে, নিয়ে ওই ভেতর বারন্দায় পড়ে ঘুমোগে যা। সক্কাল হলেই বাড়ি চলে যাবি।'

গোবিন্দ অন্যদিকে মুখ করে গম্ভীরভাবে বলে, 'বাড়ি কোথায় যে যাবো?'

'বাড়ি নেই! বাড়ি নেই তোর? বলি হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া পোড়াকাঠ, তুই কি ভুঁইফোঁড়? মা-বাপ ছিল না?'

গোবিন্দ তেমনিভাবে বলে, 'থাকবে নি ক্যানো? সবই আছে। আমি পেলিয়ে এইছি।'

'পেলিয়ে এইছিস? তাহলে তো খুব মহৎ কাজ করেছিস! বলি কেন পালিয়ে এসেছিস শুনি?'

বলে ভুনি পিসি কোমর থেকে হাত নামিয়ে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসেন।

পি. বি. গোঁফের হাসি গোঁফের ফাঁকে রেখে হাঁক পাড়েন, ওরে আলো-টালোগুলো জ্বাল কেউ।'

বাড়ির আর সকলে হাঁ হয়ে তাকায়—ভুনি পিসির বসা দেখে। ভুনি পিসিকে বসতে কদাচ দেখা যায়? সারাক্ষণই তো টাট্টু ঘোড়ার মতো খটাখট ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

গোবিন্দ অত সব জানে না, গোবিন্দ উদাসভাবে বসে, 'সৎমা মারে, খেতে দেয় না—'

'বাঃ বাঃ কী ভাগ্যিমন্ত ছেলে একখানি! তা মারে কি অমনি? তুই কিছু বদমাইসী করিস নিশ্চয়।'

'কিছু করি না! শুধু শুধুই মারে।'

'ভুনি পিসি চড়া গলায় বলেন, 'তা মারটাও একটা ভাল খাবার। খেয়েছিস বেশ করেছিস। এখন খিচুড়ি খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে এসো।

ব্যস গোবিন্দ রয়ে গেল।

কিন্তু চাকরি গোবিন্দর হলো না।

ভুনি পিসি কড়া গলায় হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, হাড়ে মাস গজাবার আগে যদি

কাজে হাত দিবি গোবিন্দ, তো তোর ওই হাড় একদিকে মাস একদিকে করবো!'

অতএব গোবিন্দ যা যা সব খেলে হাড়ে মাংস গজায়, তাই খেয়ে চলেছে প্রচুর পরিমাণে, খেলে বেড়াচ্ছে, ভুনি পিসির রান্নাঘরের দরজায় বসে তাদের গেরামের গল্প করছে, আর মাঝে মাঝে ভুনি পিসির সঙ্গে মিশনের কালীবাড়িতে যাচ্ছে, পূজোর ফল-টল নিয়ে।

ভুনি পিসি বাড়ির ছেলেদের ডেকে বলেন, 'বলি তোরা যে রাতদিন ওই সব লুডো মুডো ক্যারাম ম্যারাম খেলিস, তা গোবিন্দটাকে নিয়ে একটু খেলতে পারিস না? এখান-ওখান করে ঘুরে বেড়ায় ছোঁড়া। ওকে নিয়ে খেললে, তবু তো তোদের মুখ দিয়ে দু'দশবার ' গোবিন্দ' নামটা উচ্চারণ হবে। সেটাই লাভ।'

শুনে শুধু ছেলেরা কেন, বুড়োরাও হেসে হেসে ওকে 'হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ' করে ডাকে।

তবে বেশি ক্ষ্যাপালে গোবিন্দ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আমার সঙ্গে বেশি লাগাতে এসোনি বলচি, ঠাকুরমাকে বলে দেবো।'

কাজে কাজেই তখন আবার গোবিন্দর তোয়াজ করতে হয়।

তা গোবিন্দকে তোয়াজ মাঝে মাঝে ভুনি পিসিকেও করতে হয়।

কোনও কারণে একটু বকলেই, (মানে বকুনির কারণ তো থাকেই। গোবিন্দ যদি দুধ খেতে না চায়, মাছে কাঁটা বলে মাছ খেতে রাজি না হয়, তাহলে খাবে না বকুনি?) গোবিন্দ ঘাড় গুঁজে বলে, 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাবো না।'

তখন?

তখন তোয়াজ না করে উপায়?

কলকাতায় গিয়ে গোবিন্দ ভুনি পিসির মাথা কিনবে না?

ভুনি পিসি যে ওর 'বুদ্ধি' আর মাথা দেখে ঠিক করেছেন ওকে কলকাতায় নিয়ে ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে ভবিষ্যতে 'বিদ্যাসাগর' করে তুলবেন, তার কি হবে তাহলে?

গোবিন্দ এখন তাই ফর্সা জামা-প্যান্ট পরে চুলটুল আঁচড়ে বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে ভুনি পিসির রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে গল্প ফাঁদে, 'বুঝলে ঠাকুমা, আমাদের গেরামে না প্যায়রা, আতা, কাঁচা-নঙ্কা এসব কেউ কিনে খায় না। আর বাবুদের বাগানে যা আম হয় ইয়া বড় বড়! মালি আমাদের অমনি খেতে দেয়।'

ভুনি পিসি মধুর কণ্ঠে বলেন, 'কলকাতায় গিয়ে তোকে আতা পেয়ারা আর বড় বড় আম খাওয়াবো গোবিন্দ!'

ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আমাদের গোবর্ধন, ওরফে গোবরা, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াই ভিখারী হইয়াছিল। একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া সে একটিমাত্র পয়সা পাইল; পয়সাটি লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে, এমন সময় ভিখারির মতো কাপড় পরা এক দেবদূতের সহিত দেখা হইল। দূত বলিলেন, 'ভাই, সারা সকাল ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখনও দুটি অন্ন জুটলো না! তোমার কাছে যদি কিছু থাকে, দাও না দাদা?'

'আরে ভাই, আমারও প্রায় সেই দশা! এই একটি পয়সা পেয়েছি, তা তোমার যদি দরকার থাকে, এইটেই নেও।' এই বলিয়া গোবরা দূতকে পয়সাটি দিতে গেল।

ভিখারির উদারতা দেখিয়া দূত বলিলেন, 'বাঃ, তোমার প্রাণটা তো বেশ সাদা! সরল লোককে আমি বড় ভালবাসি। চল, আমরা দু'জনে দিন কয়েক ঘুরে-ফিরে আসি।'

গোবরা। সে তো বেশ কথা, চল, বিদেশে গেলে ভিক্ষেও মিলবে ভাল।

দূত। তা ছাড়া, আমি একটা বিদ্যে জানি, তাতেও দরকার মতো কিছু কিছু পাওয়া যাবে। আমি খুব শক্ত অসুখ সারাতে পারি আর মরা লোককেও বাঁচাতে পারি।

গোবরা। তবে তো খুব মজা, চল।

সেই দিনই দুইজনে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। তারপর ক্রমাগত কয়েকদিন চলিয়া তাঁহারা এক গ্রামে অসিয়া শুনিলেন যে, সেখানকার এক কৃষকের ভারি অসুখ। দেবদূত কৃষকের বাড়িতে গিয়া তাহার স্ত্রীকে সাহস দিয়া বলিলেন,' কোনও ভয় নেই, অসুখ আমি সারিয়ে দেবো।' এই বলিয়া ঝুলির ভিতর হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া কৃষককে খাইতে দিলেন। সেই ঔষুধের এমনি গুণ যে, খাইবামাত্র সে আরোগ্য লাভকরিল এবং বেশ সহজভাবে চলা-ফেরা করিতে লাগিল।

বলিতে গেলে, একরকম যমের দুয়ার হইতে স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া কৃষকের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না! কৃষকও আহ্লাদে অটখানা! তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রীতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে দেবদূতের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল, 'বাবা, ! তোমার দয়াতেই আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। তুমি আজ যে উপকার করলে, তা জন্মেও ভুলব না। কিন্তু বাবা আমরা বড় গরীব। আমাদের কিছু নেই, যা দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করিতে পারি। থাকবার মধ্যে—এই একটা ছাগলছানা! এইটে নিয়ে আজ আমাদের মাপ কর!'

দেবদূত। না না—আমি কিছুই চাই না। ও ছাগলটি তোমাদেরই থাক!

কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। 'দোহাই বাবা! আমাদের অনুরোধ রাখতেই হবে'—বলিয়া উভয়ে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল।

এত কাকুতি মিনতিতেও দূত ছাগলছানা লইতে অস্বীকার করিতেছেন দেখিয়া গোবরার আর সহ্য হইল না। বিশেষ— সেই -নধর পাঁঠাটির উপর তাহার বড় লোভ পড়িয়াছিল। সে দূতকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি এত বোকা কেন? খিদেয় পেটের নাড়ি হজম হচ্ছে, এ সময় ভাগ্যগুণে যদি বা কিছু জুটল, তাও তুমি নিতে চাও না! এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে কখনও ভাল হবে না।' এই বলিয়া পাঁঠাটি লইবার জন্য সেও খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

শেষে কিছুতেই তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দেবদূত পাঁঠার ছালটি গোবরার স্কন্ধে চাপাইয়া সে স্থান হইতে বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক দুপুরবেলা তাঁহারা এক জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। তখন দূত বলিলেন, 'তুমি

এখানে রান্নার আয়োজন কর, আমি স্নান করে আসি। ফিরে এসে দু'জনে একসঙ্গে খাবো।' এই বলিয়া দেবদূত স্নান করিতে গেলেন।

এদিকে গোবরা পাঁঠাটি রাঁধিয়া বসিয়া আছে, দূত আর আসেন না। মাংসের সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল। গোবরার মুখ দিয়া টসটস করিয়া লাল ঝরিতে লাগিল। তবুও দূতের সাক্ষাৎ নেই। শেষে কিছুতেই আর লোভ সামলাইতে না পারিয়া, সে হৃৎপিণ্ডটা বাছিয়া খাইয়া ফেলিল। তার পর গোবরা মুখ মুছিতেছে, এমন সময় দূত আসিয়া উপস্থিত! দূত পূর্বে তাহার কীর্তি জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অসুখের ভান করিয়া বলিলেন, 'দেখ,আমার বড় অসুখ হয়েছে, আমি মাংস খাবো না, তুমি খাও! আমাকে কেবল হৃৎপিণ্ডটা দাও।'

গোবরা বলিল, 'সে কি, মাংস খাবে না—হঠাৎ এমন কি অসুখ হলো? আচ্ছা, বেশি না খাও, একটু খেতেই হবে। আগে তোমাকে হৎপিণ্ডটা এনে দি।' এই বলিয়া সে খুব ব্যস্ততার ভান দেখাইয়া হৃৎপিণ্ডটা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সেটা যে কোথায় গিয়াছে, পাঠক-পাঠিকার তাহা জানিতে বাকি নাই। অথচ সত্য কথাটা দূতকে বলিতেও গোবরার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরে সে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'দেখ ভাই, অনেক খুঁজিলাম, কিন্তু হৃৎপিণ্ড তো পেলাম না! বোধ হয়, পাঁঠার হৃৎপিণ্ড থাকে না।'

দেবদূত। বাঃ সব জন্তুর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই? তা কি কখনও হয়!

গোবরা। হবে না কেন? এই তো কতক্ষণ ধরে খুঁজলাম। থাকলে কি আর পাওয়া যেত না?

গোবরার কথায় দেবদূতের ভারি রাগ হইল। কিন্তু তিনি কোনও রকমে সে ভাব চাপিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা— না থাক, এখানে আর দেরি করা হবে না। তুমি শিগগির মাংস খেয়ে নাও।'

দূতের মুখের কথা শেষ না হতেই গোবর্ধন টপাটপ সেই আস্ত ছাগল ছানাটির সদ্গতি করিল! তারপর দূতের সাথে বাহির হইল।

কিছু দূর গিয়া তাঁহারা সম্মুখে একটা নদী দেখিতে পাইলেন। হাঁটিয়া পার হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। দেবদূত যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে তিনি হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। হাঁটু পর্যন্তও ভিজিল না। কিন্তু গোবর্ধন যেই নামিয়াছে, অমনি তাহার কোমর অবধি জলে ডুবিয়া গেল এবং ক্রমশই জল বাড়িতে লাগিল। সে ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিল, 'ভাই তুমি

তো খুব মজার লোক;—আমি ডুবে মরি আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ!'

দূত বলিলেন, 'হৃৎপিণ্ড কোথায় গেল যদি বল, তবে তোমাকে ওঠাব!'

গোবরা দেখিল বড়ই মুশকিল। মিথ্যা কথা স্বীকার করেই বা কিরূপে? বলিল, 'আমি জানলে কি আর আগে বলতাম না!'

একেই গোবরার দেহের ভার,তাহার উপর আস্ত পাঁঠাটা তখনও পেটের ভিতর গজগজ করিতেছিল, সে ভারটাও বড় কম নয়! এই দুই ভারে গোবরা ক্রমশই ডুবিতে লাগিল। শেষে তাহার নাক অবধি জল উঠিল —প্রাণ যায় যায়।

দূত বলিলেন, 'এখনও দোষ স্বীকার কর, তা না হলে তোমার আর রক্ষে নেই!' কিন্তু গোবরা কিছুতেই দোষ স্বীকার করিল না। যাহা হউক , তাহাকে প্রাণে মারিতে দূতের ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া ফেলিলেন।

তার পর আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন সকালে তাঁহারা এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সেই দেশের রাজকন্যা অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে মারা গিয়াছে। শুনিয়া দূত বলিলেন,'চল, রাজবাড়িতে যাই।'

রাজবাড়িতে আসিয়া দেবদূত মরা মেয়েটিকে একবার বেশ করিয়া দেখিলেন। তারপর রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, শোকে অধীর হবেন না। রাজকুমারীকে আমি বাঁচিয়ে দেবো। আমাকে একখানা কড়া, এক কলসী জল, কিছু কাঠ ও আগুন আনিয়ে দিন।'

রাজার আদেশক্রমে তখনই সমুদয় দ্রব্য আসিল। দেবদূত সেই জিনিসগুলি আব মরা মেয়েটিকে লইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন! তার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আগুন জ্বালিয়া তাহাতে এক কড়া জল চাপাইলেন এবং মেয়েটির মৃতদেহ খন্ড খন্ড করিয়া সেই জলে সিদ্ধ করিতে দিলেন। অনেকক্ষণ সিদ্ধ হইয়া যখন হাড় হইতে সমুদয় মাংস খসিয়া পড়িল, তখন তিনি সেই হাড়গুলি লইয়া, একস্থানে সাজাইয়া কি এক মন্ত্র পাঠ করিলেন। অমনি দেখিতে দেখিতে তাহার উপর মাংস হইল। ক্রমে সর্বাঙ্গ চর্মে আচ্ছাদিত হইল, তারপর মেয়েটি উঠিয়া বসিল। তখন দেবদূত দরজা খুলিয়া দিলেন। রাজা মরা মেয়েকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিয়া, আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং দেবদূতকে এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ, অর্ধেক রাজ্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু দেবদূত, রাজ্য তো দূরের কথা, সামান্য কিছু অর্থ পর্যন্ত লইতেও সম্মত হইলেন না! দূতের ব্যবহারে

গোবরার বড়ই রাগ হইল। সে কৌশলে রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিল। রাজা আনন্দের সহিত তাহার ঝুলি মোহরে ভরিয়া দিলেন।

রাজবাড়ি হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গিয়া, দূত বলিলেন, 'তুমি মোহর নিয়ে ভাল কাজ করনি! যা হোক যখন নিয়েছ, তখন এস ভাগাভাগি করি, এই বলিয়া দূত সেই মোহরগুলি তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিন ভাগ করিবার উদ্দেশ্য কি, গোবরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগ্রহের সহিত দূতকে জিজ্ঞাসা করিল, ' আমরা তো মোটে দু'জন, তবে তিন ভাগ করলে কেন?'

দূত বলিলেন, 'এক ভাগ তোমার, এক ভাগ আমার আর এক ভাগ পাঁঠার হৃৎপিণ্ডটা যে খেয়েছে, তার।'

দূতের মুখের কথা শেষ না হতেই, গোবরা বলিয়া উঠিল, ' সে তো আমি, —আমিই সেটা খেয়েছি। ও ভাগটা তবে আমার।'

দেবদূত। সে কি পাঁঠার হৃৎপিণ্ড থাকে না!

গোবরা। আরে, এও কি একটা কথা! সব প্রাণীর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই! তখন আমি মিছে কথা বলেছি!

দেবদূত। তুমি মিছে কথা বল? তবে আমি আর তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। মিথ্যেবাদীকে আমি বড় ঘৃণা করি। এ সব মোহরই তুমি নাও, আমি চললাম।

গোবরার হাতে তখন অনেক টাকা, সে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। বলিল, 'তা এখন যেতে পার, এ টাকায় আমার অনেক দিন চলবে।'

দেবদূত বলিলেন, 'তুমি নেহাত মূর্খ, এ টাকা কয় দিন! দু'চার বছরের মধ্যেই আবার তোমাকে ভিক্ষেয় বেরুতে হবে! যা হোক, এতদিন এক সঙ্গে আছি, তোমাকে একটা কিছু না দিয়ে গেলে ভাল দেখায় না! এই ঝুলিটা তুমি নাও; তোমার যখন যা পেতে ইচ্ছে হবে, তার নাম করে—আমার এই ঝুলির ভিতর আয়—এই কথা বলামাত্র সেই জিনিস তখনই তোমার ঝুলির মধ্যে আসবে'। এই বলিয়া দেবদূত গোবরাকে ঝুলিটা দিয়া এক দিকে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গীকেচলিয়া যাইতে দেখিয়া গোরবার দেশভ্রমণের সাধ মিটিয়া গেল। সে দেশে ফিরিয়া বুক ফুলাইয়া নবাবী আরম্ভ করিল। হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সিপাই -শান্ত্রীতে তাহার প্রাসাদ ভরিয়া গেল। বাবুয়ানার চোটে দু-তিন বৎসর পরে তাহার হাতে আর কিছুই রহিল না। শেষে দূতের কথাই সত্য হইল।

গোবরাকে আবার ঝুলি কাঁধে করিয়া বাহির হইতে হইল। পেটের দায়ে

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া, কোনও দিন দুটি অন্ন জুটে, কোনও দিন জুটে না। সুখের দিনের তেল কুচকুচে ভুঁড়ি দুঃখের পেষণে, একেবারে শুকাইয়া গেল! এই সময় গোবরা একদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়াও থাকিবার মতো স্থান না পাইয়া, সন্ধ্যাব কিছু পরে একটা সরাইয়ে উপস্থিত হইল এবং সেইখানেই রাত্রিবেলা থাকিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সরাইয়ের কর্তা বলিলেন, 'এখানে জায়গা নেই—তুমি অন্য চেষ্টা দেখো।'

গোবরা। বাঃ, তুমি তো খুব মজার লোক! জায়গা নাই বললেই হলো। এত রাত্তিরে আমি এখন যাই কোথায়?

কর্তা। তা আমি কিজানি— যেখানে খুশি যেতে পার।

গোবরা দেখিল, লোকটা নিতান্ত বেয়াড়া। তর্কে কোনই লাভ নাই। তাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা সামনের ঐ বাড়িটা কার?'

কর্তা। আরে বাপরে! ও বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে! ওটা ভূতের আড্ডা!

গোবরা। আমার অত ভূতের ভয় নেই!—ওটা যদি তোমাদের বাড়ি হয়, তবে চাবিটা আমায় দাও, আমি ওখানে গিয়ে থাকি!

কর্তা। কেন বাপু, প্রাণটা হারাবে! গরিবের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরে যাও!

গোবরা। বেশ, প্রাণ যায় আমার যাবে ! তুমি চাবিটা দাও।

'কিছুতেই শুনলে না, তবে মর গে!'—এই বলিয়াই কর্তা চাবিটা ছুড়িয়া দিলেন।

গোবরা একটা আলো লইয়া সেই বাড়িতে প্রবেশ করিল এবং ভাল রকম একটি ঘর বাছিয়া লইয়া তাহাতে শয়ন করিল। তারপর আন্দাজ বারটা বাজিয়াছে, এমন সময় ভয়ানকএকটা শব্দে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিল যে, বিকট-মূর্তি নয়টা ভূত , রক্তবর্ণ চক্ষু বাহির করিয়া, পরস্পরের হাত ধরিয়া নাচিতেছে আর নাকি সুরে চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই তাহার দিকে আসিতেছে।

ভূতগুলোর বেয়াদপি দেখিয়া গোবরার বড় রাগ হইলে। সে খুব জোরে জোরে ধমক দিয়া বলিল, 'এইও! — চোপরাও! ফের চেঁচাবি তো এক ঘুষিতে মাথার খুলি ভেঙে দেবো! যদি ভাল চাস এখনি দূর হ!

গোবরার তিরস্কারে ভয় পাওয়া দূরে থাক, ভূতগুলো নাচিতে নাচিতে একেবারে কাছে আসিয়া তাহার গায়ের উপর লাফাইয়া উঠিল এবং সর্বাঙ্গে আঁচড় -কামড় দিতে লাগিল। গোবরাও সহজ পাত্র নহে; সে সুবিধামতো দুই

দুইটা ভূতের টুটি চাপিয়া ধরিয়া, এমন জোরে তাহাদের মাথায় মাথায় ঠুকিয়া দিতে লাগিল যে, ভূত বাছাদের নাকালের একশেষ—এক একবার বা কয়েকটাকে ধরিয়াই দেওয়ালে এক আছাড়! আর অমনি ঘরের ছাদসুদ্ধ কাঁপিয়া উঠে!—এইভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু সে একা, নয়টা ভূতের সহিত কতক্ষণ পারিয়া উঠিবে! যাহা হউক, হঠাৎ দেবদূতের সেই ঝুলির কথা তাহার মনে পড়িল। ইহার পর গোবরা যেই—'তোরা সবগুলো এইটের মধ্যে আয়' —বলিয়া ঝুলিটা বাহির করিয়াছে, অমনি দেখিতে দেখিতে সেই নয়টা ভূতই গুড়ি-সুড়ি হয়ে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল! আর গোবরাও সময় বুঝিয়া তাহার মুখ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। বাকি রাতটুকু সে বেশ আরামেই ঘুমাইয়াছিল।

পরদিন সকালে সরাইয়ের কর্তা গোবরাকে জীবিত দেখিয়া আর তাহার মুখে ভূতের কাহিনী শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আমি মূর্খ, চিনতে না পেরে কাল কটু কথা বলেছি; আপনি আমাকে মাপ করুন। আপনি নিশ্চয় কোনও দেবতা, দেবতা ভিন্ন এ কাজ কি মানুষের দ্বারা সম্ভব!'

গোবরা। না বাপু, আমি দেবতা-টেবতা কিছুই নই।—যা হ'ক, তোমার ভূতের ভয় ঘুচলো? এখন তবে আমি আসি।

তখন কর্তা মহাশয় তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং যথেষ্ট টাকা-কড়ি পুরস্কার দিলেন। গোবরা সেই টাকা ও ঝুলি লইয়া সোজাসুজি এক কামারের দোকানে উপস্থিত। সেখানে কয়েকজন সর্দার কামারকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি যতক্ষণ না থামতে বলি, তোমরা এই ঝুলির উপর খুব ভারী মুগুর দিয়ে ঘা দিতে থাক। এজন্যে যত টাকা চাও, আমি দেব।' টাকার লোভে কামারেরা বেদম ঘা দিতে শুরু করিল। এক এক ঘা পড়ে আর অমনি ঝুলির ভিতর 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ—মহাচিৎকার! কামারেরা তো ভয়ে জড়সড়! গোবরা তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, খুব জোরে ঘা দাও।' তাহারা সাহস পাইয়া আবার ঘা দিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা ঘা দিবার পরেও নাকিসুরের কান্না শুনা যাইতে লাগিল। শেষে সে গোঙানিও যখন থামিয়া গেল, তখন গোবরা ঝুলির বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। ভূতের মধ্যে একটা ছিল ভারি চালাক। চিৎকার করিলেই প্রাণ যাইবে। ইহা সে বুঝিয়াছিল, তাই চুপ-চাপ এক কোণে পড়িয়াছিল। গোবরা যেই ঝুলির বাঁধন খুলিয়াছে, অমনি সেই ভূতটা বাহির হইয়া বাদুড়ের মতো ডানা মেলিয়া দে পিটটান! বাকি ভূতগুলোর হাড়-গোড় চুরমার হইয়া গিয়াছিল!

ইহার কিছুকাল পরে গোবরার পরলোকে যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন রাস্তা দিয়া সেখানে যাইতে হয়, তাহা সে জানিত না। কাহাকেও যে জিজ্ঞাসা করিবে, তেমন মানুষ পাওয়া ভার। কাজেই গোবরার মনের ইচ্ছা কিছুদিন মনেই রহিয়া গেল। ইহার পর একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা মোড়ে আসিয়া দেখিল যে, পথটা সেখান হইতে দুই দিকে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহার কোনটাতে যাইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া, দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় এক সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া গোবরা, কোন পথ কোথায় গিয়াছে, তাহা জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, 'এই যে সোজা বড় রাস্তা দেখছ, এটি নরকে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি নরকে যেতে পার। আর ঐ যে ছোট আঁকা-বাঁকা রাস্তা দেখছ, ওটি স্বর্গে। ঐ রাস্তা ধরে বহুকাল চললে তবে স্বর্গে যাওয়া যায়।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া গোবরা ভাবিল , 'আমি বুড়ো মানুষ, বহুকাল যে চলতে পারি, সে শক্তি কই, তার চেয়ে এই সোজা রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি নরকেই যাই!'—এই ভাবিয়া সে নরকের পথ ই ধরিল। খানিক দূর গিয়া প্রকাণ্ড একটা ফটক দেখিতে পাইল। সেই ফটক দিয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়। সে ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই যে ভূতটা তাহার ঝুলির ভিতর হইতে পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, বিকট মুখভঙ্গি করিয়া সেখানে সে পাহারা দিতেছে। ভূত গোবরাকে দেখিবামাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে, দরজা বন্ধ করিয়া এক ছুটে তাহাদের রাজার কাছে গিয়া বলিল, 'সর্বনাশ, সর্বনাশ— সেই গোবরা এসেছে! আর রক্ষা নেই! ও যদি এখানে ঢুকতে পায়, তবে আমাদের সকলকেই প্রাণে মারবে! ওর কাছে একটা ঝুলি আছে , একবার তাতে পুরে আমাদের বাছা বাছা আটজনকে মেরে ফেলেছিল!' গোবরার ঝুলির কথা শুনিয়া ভূতদের রাজার ভয় হইল। যাহাতে সে কোনও মতেই নরকে ঢুকিতে না পায়, তিনি একশত পালোয়ান ভূত ডাকিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

নরকের দরজা বন্ধ ! গোবরা অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া, স্বর্গের রাস্তা ধরিয়া চলিল। ক্রমাগত বহুকাল চলিয়া অবশেষে সে স্বর্গের ফটকের কাছে উপস্থিত হইল! তাহার পূর্বপরিচিত সেই দেবদূত সেখানে পাহারা দিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গোবরার আনন্দ আর ধরে না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি হে ভাই, তুমি এখানকার মালিক? তবে তো ভালই! একবার দরজাটা খুলে দেও আমি স্বর্গে যাই।'

দূত বলিলেন , 'আরে —তাই তো! এতদিন তুমি কোথা ছিলে? ভাল আছ তো? তা এত কষ্ট করে এলে বটে, কিন্তু ভাই দরজা খোলবার তো হুকুম নেই। যারা যারা এখানে আসবে , আমার কাছে তাদের নামের একটা তালিকা আছে। কই তার মধ্যে তোমার নাম তো দেখছি না!'

গোবরা। সে কি ! তবে আমি যাই কোথা! স্বর্গেও স্থান নেই, নরকের দরজাও বন্ধ! আমার কি তবে কোথাও একটু জায়গা হবে না? তোমার এই ঝুলিটাই তো যত নষ্টের মূল! এইটে দেখতে পেয়েই নরকের দারোয়ান আমায় ঢুকতে দিলে না! তা তুমি যদি আমাকে স্বর্গে ঢুকতে না দাও, তোমার ঝুলিটা তবে ফিরিয়ে নেও। আমি আবার নরকে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি , কোনও সুবিধে করতে পারি, কি না!'

'তা বরং দেও,'—এই বলিয়া দেবদূত হাত বাড়াইয়া যেই ঝুলি লইয়া ভিতরে রাখিয়াছেন, অমনি গোবরার মহাসুযোগ উপস্থিত! সে মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার ইচ্ছে—এখনি ঐ ঝুলির মধ্যে যাই।'

মুখের কথা শেষ না হইতেই, গোবরা তাহার সেই ঝুলির ভিতর গিয়া উপস্থিত। তাহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দেবদূত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সাত ভুতুড়ে

মহাশ্বেতা দেবী

ফল্গু যে বড় হতে না হতে অমন গল্পবাজ হবে তা আগে কেন বুঝিনি এখন তাই ভাবি। সব সময়ে ওর জীবনে তাজ্জব সব ঘটনা ঘটত আর আমাদের গল্প বলত। সে সব কি সত্যি, তাও আর জানা যাবে না। ওর ঠিকানাটা তো দিয়ে যায়নি, যে গিয়ে জিগ্যেস করব।

ওষুধ কোম্পানির কাজ নিয়ে যখন পাটনা গেল, তখন তো ওকে সমানে ঘুরতে হত। তখন নাকি অবধলাল বলে একটা লোককে নিয়ে সে ঘুরত। অবধলাল সঙ্গে থাকলে , গাঁজা খাবে, পূর্ণিয়া বললে মতিহারি টিকিট করবে, নোট হাতে পেলে খুচরো ফেরত দেবে না, তবু ওকে সঙ্গে রাখা চাই।

কেন রাখা চাই?

আহা! বুঝলে না! কোন বাড়িটায় বিদেহীদের বাস, কোন রাস্তায় সন্ধের পর ডাইনি ঘোরে, এ বিষয়ে ওর একটা ব্যাপার আছে।

তাতে তোর কি ?

তুমি কি বুঝবে? কত জায়গা ঘুরতে হয়। কখন, কোথায় গিয়ে ফেঁসে যাব, এই তো সেবার.....

কি হয়েছিল?

কাজে নয়, কাজ সেরে বেড়াতেই গিয়েছিল ফল্গু। ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি

কোন এক জায়গায় পেয়ে গেল জঙ্গল বাংলো। চৌকিদার নাকি বলে দিল, জল-টল তুলে দিয়ে, খানা বানিয়ে দিয়ে ও চলে যাবে। রাতে ও থাকবেই না।

ঘর দুটো। দুটোই ঘরই ফাঁকা। লোক নেই। দু' কামরাতেই নেয়ারের খাট। চেয়ার-টেবিল আছে। অবধলাল ফল্গুকে কিছুতেই ভাল ঘরটায় থাকতে দিল না।

ছোট ঘরটায় দু'জনে থাকবে।

কেন রে?

অবধলাল শুধু বলে, ও ঘরে থাকবেন কি দাদা, পরিষ্কার দেখলাম ঘরে স্বামী-স্ত্রী বসে আছে।

ফল্গু তো কিছুই দেখেনি, কিন্তু বাইরে তখন বিকেল শেষ হচ্ছে। হেমন্তের বিকেল! বাতাসটা ঠাণ্ডা হচ্ছে। চারিদিকে জনমানব নেই। এ সময়ে অবধলালের কথা অমান্য করতে গেলে অবধলাল তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে।

অবধলাল চোখ মটকে বলল, ব্যাপারটা বুঝলেন না? ওই যে চৌকিদার, ও কেন রাতে থাকে না? ও ঘরে কারা বসে আছে, তা তো ও জানে। কেন বসে আছে, সেটাই দেখতে হবে।

ফল্গু তো দেখেছে কামরা জনশূন্য, জানালা বন্ধ অবধলাল কি তা মানে? ও চোখ মটকে বলল, রাতে খেয়ে-দেয়ে আপনি ঘুমোন, আমি দেখি ওরা কি করে। ওঃ মেয়েটা ছেলেমানুষ। ভয়ও পেয়েছে খুব, লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

ফল্গু ধমকে বলল, আমি ভীতু মানুষ। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও মাঝখানের।

দাদা! অবধলাল থাকতে আপনার কাছেও কেউ আসবে না, কোনও অনিষ্ট করবে না। আমিও ওদের চিনতে পারি, ওরাও আমাকে চিনতে পারে।

এ সব চেনাচিনির কথা সন্ধের মুখে কি ভাল লাগে? চৌকিদারটা ও সময়ে তেলভরা দুটো লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। তারপর ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা, রুটি আর জলের কলসি রেখে গেল ঘরে। বলে গেল, সাবধান থাকবেন বাবু, বাইরে বেরোবেন না।

ফল্গুকে আর দু'বার বলতে হলো না। ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা কে কবে খেয়েছে বলো? তা ফল্গুবাবুর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ও ছাপরায় অড়র

ডাল আর পিঁপড়ের ডিমের মোগলাই কারি (অবধলালের রান্না), গৈবীপুরে আলু আর আটার গোলা সেদ্ধ (ওর রান্না), মজঃফরপুরে কামরাঙা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল (অবধলালের রান্না) খেয়েছে। এ সব কথার সত্যি আর মিথ্যেও জানা যাবে না। কেননা অবধলালও ফল্গুর উধাও হবার সময় থেকেই উধাও।

সত্যি বলতে কি, অবধলালকে আমরা চর্মচক্ষে আজও দেখিনি। ও আরেকটা ফল্গুবাবুকে খুঁজছে। যাকে পেলে তার সঙ্গে জুটে যাবে।

রাতে তো ফল্গু খুব ঘুমোল। সকালে উঠে দেখে অবধলাল চৌকিদারকে খুব চোটপাট করছে।

ব্যাপার তো কিছুই নয়। লোকটা ওই আওরতকে খুন করেছিল। নিজেও খুদকুশি (আত্মহত্যা) করে। তা তুমি এ কামরায় কোনও বন্দোবস্ত করনি কেন?

কি করব বাবু?

অবধলাল থাকতে ভাবনা?

অবধলাল তার ঝোলা থেকে কি একটা জড়িবুটি বের করল। ঘরের দেয়াল ফুটো করে পুঁতে দিল। ওগুলো নাকি ভূত তাড়াবার মোক্ষম ওষুধ।

ফল্গুরা যখন ট্যুর সেরে ফিরছে, সেই চৌকিদার তো অবধলালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। না, না, সে দুটো ভূত আর আসছে না। তবুও ভুতুড়ে ঘর শব্দটা চৌকিদার চালু রেখেছে।

কেন?

চৌকিদার খৈনি মুখে দিয়ে বলল, চৌকিদারিতে আর কি মিলে বাবু! এখন আমরা মাঝে মাঝে ও ঘরে একটু জুয়া-সাট্টা খেলি। ধরম পথে পয়সাও কামাই হয় দুটো।

পুলিশ জানে?

পুলিশের সঙ্গেই তো খেলি বাবু। এ আপনারা খুব বড় কাজ করলেন। পাবলিকের ডাকবাংলো। এখন পাবলিকের কাজে লাগছে। সবাই অবধলালজীকে খুব আশীর্বাদ করছে। তবে কি বাবু! কামরায় তো ঢুকতে পারে না। রোজ ওই তেঁতুল গাছে বসে দু'জনে খুব ঝগড়া করে।

তা করুক না। ও বেচারীরা যায় কোথায়! ভূত বলুন, পিশাচ বলুন, ওদের তো থাকার জায়গা চাই। আমার গ্রামেই তো ডাক্তারবাবুর বউ যখন ভূত হয়ে গেল, কেবল সাবান চুরাত, কুয়াতলায় চান করত। আমিই তো তার ব্যবস্থা করে দিলাম। এখন সে পুকুরপাড়ে বেল গাছে থাকে। রোজ একটা সাবান মেখে স্নান

করে।

ফল্গু বলল, তবে যে শুনি গয়াতে গেলে......

অবধলাল ফচফচ করে হাসল। বলল, গয়াজীতে গেলেও বাবু! ভূতের মধ্যে যারা গিটগিটা আর পিরপিচা, তাদের মুক্তি হয় না।

সে আবার কি?

সে আপনি বুঝবেন না। সবচেয়ে পাজি হলো কিরকিচা ভূত। গ্রামের ঝগড়াটি মেয়েছেলেরা কিরকিচা ভূত হয়। তবে হ্যাঁ, বহুত কাজও করে।

কি রকম?

এই আমার মা আর পিসিকে দেখুন না। গ্রামে ঝগড়া লাগলে সবাই ওদের নিয়ে যেত। ওদের মতো গাল দিতে আর ঝগড়া করতে কেউ পারত না। এই যে দু'জনে মরে গেল মেলায় গিয়ে কলেরা হয়ে, এখনো কত কাজ করে। বাপরে বাপ!

কি করে?

সন্ধে হলেই আসবে, ঘরের চালে বসবে,আর বাবাকে, আমার সৎমাকে, বাড়ির সকলকে গাল দেবে। কি ঠিক মতো কাজ করেনি। বাবা মাঠে গিয়ে কাজ না করে ঘুমোচ্ছিল কেন, বউরা কেন ঝগড়া করেছে, বাসনে কেন এঁটো থাকবে, কাপড়ালত্তা কেন সাফ হয় না—এই নিয়ে এক ঘণ্টা গাল দেবে, তারপর চলে যাবে।

এ তো সর্বনেশে কথা!

অবধলাল ক্ষমার হাসি হাসল। বলল, বাবুজী! কিরকিচা ভূত না থাকলে কোনও গ্রামে শান্তি থাকে না। মেয়েছেলেরা সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে। কিরকিচারা গিয়ে ডবল তিন গালি দিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা রাখে। বাপরে! আমার বাবা বলছিল গয়াজীতে যাব। তাতে মা আর পিসিমা গয়াজী গিয়ে এমন গাল দিতে থাকল যে পাণ্ডাজী বাবাকে লাঠি দিয়ে পেটাল। তুমি কিরকিচার পিণ্ড দিতে এসেছ?

চৌকিদারও বলল, হাঁ হাঁ, কিরকিচা প্রতি গ্রামে থাকা খুব দরকার।

ফল্গুর মুখে গল্প শুনে আমাদের খুব ইচ্ছা হয়েছিল একটা কিরকিচা ধরে আমার। মায়ের পুষ্যি যত পাড়ার বাজখেঁয়ে মেয়েছেলে, তারা কি কম ঝগড়া করত?

সাতভুতুড়ে বাড়িতে অবশ্য ও ভুতের বাড়ি জেনে যায়নি। দুমকা ছাড়িয়ে

অনেক দূরে কোথায় রাজবাড়ি পোড়ো হয়ে আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল।

বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই দুমকার বন্ধু কমলবাবু বললেন, আজ চোখে দেখুন, তারপরে সকালে এসে ভাল করে দেখবেন ঘুরে ঘুরে।

সাপের ভয়?

শীতকালে সাপের ভয়?

বদলোকের আড্ডা আছে?

না মশাই, আসলে......

অবধলাল তো মহা খুশি। কি ব্যাপার বাবু? ভূত আছে নাকি? গিটগিটা না পিচপিচা?

সে আবার কি?

বাবুজী, জ্যান্ত মানুষের জাত আছে, ভূতের জাত নেই? গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, কত জাতের ভূত আছে তা জানেন?

না বাপু, আমি জানতেও চাই না।

কি আছে ওখানে?

সবাই বলে সাতটা ডাকাত এ তল্লাটে খুব তরাস তুলেছিল। তা রাজবাড়ির একটা কামরায় ডাকাতির মাল ভাগ করতে গিয়ে মারামারি করে সাতটাই মরে। তারাই ও ঘরে দাপাদাপি করে।

মনে হচ্ছে গিটগিটা।

ডাকাতির মালের লোভে যেই গেছে সেই মারা পড়েছে। কেউ যায় না।

অবধলাল বলল, তাহলে তো থেকে যেতে হয়। আমার নাম অবধলাল। আমি সাতটাকে তাড়াব।

কমলবাবু বললেন, আমি ওর মধ্যে নেই।

গ্রামের লোকরা খুশি। বাপরে, রাজবাড়ির বাগান তো এখন জঙ্গল। ভয়ের চোটে কেউ কুলটা আমটা আনতে যায় না। ভূতগুলো তাড়াও বাবু। আমাদের ঘরে আজ থাক। খাও-দাও আরাম করো।

কমলবাবুও থেকে গেলেন। ও বাড়িতে উনি ঢুকবেন না। কিন্তু তামাশা তো দূর থেকেও দেখা যায়।

মহাতোদের গ্রাম। ফলে মুরগি, ভাত, জবর খাওয়া হলো।

পরদিন অবধলাল আর ফল্গু বাড়িতে ঢুকল। একেবারে পোড়ো বাড়ি। দোতলা দিয়ে বটগাছ উঠেছে বড় বড়।

একতলায় দুটো ঘর তবু থাকার মতো। অবধলাল বড় ঘরটা দেখিয়ে বলল,

ওখানেই বেটাদের আড্ডা।

সে ঘর যেমন ধুলোপড়া, তেমনি বড়। কোণের দিকে একটা কাঠের সিন্দুক।

আরে আরে দেখুন!

কি দেখব?

জানালা দিয়ে দেখুন।

জানালার নিচে বেশ বড় একটা খাত। পাশে একটা গাছ।

ওর মধ্যে কিছু আছে বোধ হয়।

পাশের ঘরটা সাফসুৎরো করল অবধলাল। গ্রাম থেকে চাটাই আনল, বালিশ, তেলভরা লণ্ঠন, কুঁজো বোঝাই জল। সন্ধের মুখে বলল আমি তো চললাম। আপনার ডর লাগে তো আপনি থেকে যান গ্রামে।

ফল্গু বলল, মোটেই না, আমিও যাব।

লোকগুলোর লাশ কোথায় গেল?

মাহাতোরা বলল, সে তো সে সময়েই পুলিশ নিয়ে যায়। পুলিশ ডাকাতির মালও খুঁজে, পায়নি।

অবধলাল আর ফল্গু তো চলে এল। ফল্গু বলল, অবধলাল, আমি শুয়ে পড়ছি। তুমি ভূত তাড়িয়ে তবে আমাকে ডাকবে।

আগে দেখি বেটারা কেমন জাতের আর একটু কাজ সেরে আসি।

কি কাজ?

খাতের পাশে গাছটা দেখলেন না?

দেখলাম তো!

বেচারি! ওখানে একটা কিরকিচা আছে। বেচারি আছে বলেই কেউ জানে না। একটু খৈনি, একটু বিড়ির জন্যে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

এখানেও কিরকিচা?

বাবুজী, কিরকিচা কোথায় নেই?

ও কেন ভূতগুলোকে তাড়াচ্ছে না?

কিরকিচা বলে ওর আত্মসম্মান নেই? ওকে কেউ বলেছে?

তুমি কি ওকেই ডাকবে?

না না, সে দেখা যাবে। একটু খৈনি, দুটো বিড়ি, একটা দেশলাই তো রেখে আসি। বাবুজী, ভূত তাড়াবার জুড়িবুটিও তো আমাকে একটা কিরকিচাই দিয়েছিল।

এমনি সময়েই প্যাঁচা ডাকল। আর ফল্গু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে সে কি গণ্ডগোল! অন্য কারও গলা শোনা যাচ্ছে না, অবধলাল চেঁচাচ্ছে।

তাই বলো! কিরকিচার ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছ? কেন, পুলিশ যখন লাশ নিয়ে গেল। তখন সঙ্গে গেলে না কেন?

একটা গলা মিউমিউ করে বলল, গিটগিটা কোথাও যেতে পারে?

সর্দার কে?

আমিই তো ছিলাম।

ঘরে কেন? বাইরে জঙ্গল আছে না?

অহি কিরকিচা!

ওর ভয়ে মরে গেলে?

হাঁ বাবু। আগে তো মারামারি করে মরলাম। তারপর পালাতে যাব, কিরকিচা যা গাল দিল আবার মরে গেলাম। এখন তো পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু দু'বার মলে কেমন করে পালাব?

হায় হায়, এ তো বহোত আফশোস। ডবল ডেথ হয়ে গেল। তোমরা তো গিটগিটাও নেই, পিচাপিচাও নেই। বিলবিলা হয়ে গেছ, হায় হায়!

আমাদের ছেড়ে দাও ভৈয়া।

ছাড়ব তো যাবে কোথায়?

তা ফল্গু বলল, অবধলাল বলেছে যে কখনো কোনও কিরকিচা নিজের গ্রাম থেকে নড়ে না।

যদি বেড়াতেও আসে!

না না, সে অসম্ভব।

ফল্গুকে বলতাম, অবধলালের কথা বিশ্বাস করিস?

ও বলত, বিশ্বাস করব না? জঙ্গলে যারা কাজ করে তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ডরায়। বাঘ মানুষ দেখলে সরে যায়। ভালুক তেড়ে এসে আক্রমণ করে। সেবার হাজারিবাগে.........

এখন গল্পের সূতো ধরিয়ো, এমন হতভাগ্য বলত, সকাল আটটা বসে গল্প করার সময় নয়। থলিটা কোথায়, বাজারে চলো।

আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে যাবে, যা দেখবে, সব কিনবে আর বাড়ি ঢুকে বলবে, ছ্যা ছ্যা, বুড়ো হয়েছে তো! যা দেখে সব কেনা চাই।

গল্প বলার সময় সন্ধেবেলা। বাগানের চাতালে বসে। লোডশেডিং হলে আরও জমত।

হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘোরার অমন মজা বিট অফিসারের সঙ্গে পায়ে হাঁটো, তাঁবুতে থাক, মাঝেমাঝেই দেখবে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে।

তেমনি ঘুরতে ঘুরতে ওরা নাকি ভালুকের সামনে পড়ে। ভালুক দেখে ওরা তো দৌড় লাগিয়েছে। ভালুকও তেড়ে আসছে। তখন অবধলাল চেঁচিয়ে বলছে, আরে জঙ্গলে তো কত আওরৎও মারা পড়েছে। একটাও কিরকিচা, নেই? আরে কিরকিচা, কোথায় আছ?

সঙ্গে সঙ্গে গাছপালায় ঝড় তুফান তুলে ভালুকের দু'পাশে দুই কিরকিচা এমন চেঁচাতে শুরু করল যে ভালুক ঘাবড়ে গিয়ে পালাল।

এটা সত্যি?

এটা সত্যি। ইচ্ছে হলেই বিট অফিসারকে জিগ্যেস করে জেনে আসতে পারো।

তা, অবধলাল সঙ্গে থাকত বলে ফল্গুরও ঝোঁক চেপেছিল ভূতের বাড়ি হলেই ওকে নিয়ে সেখানে থাকবে।

বাইরে থেকে কে খনখন করে হাসল। ঠিক যেন হায়েনা হাসল।

যৈসে ভি হো, ভাগ যায়েগা।

কে যেন খনখনে গলায় বলল, সত্যি কথাটা বল না বাপু। আমি তোদের কেন পুরে রেখেছি?

ফিঁচফিঁচ করে কেঁদে একজন বলল, আরে লাখিয়াকে মা! তোর তামাকুর ডিব্বা আমরা নিইনি।

গিরগিটার দোহাই।

গিরগিটার দোহাই?

বিলবিলার দোহাই।

বিলবিলার দোহাই?

আমার কাছে মাপ চাইবি?

চাইলাম, চাইলাম।

যা তবে ছেড়ে দিলাম।

অবধলাল এ সময়ে কি যে করল কে জানে। ঘরে ভীষণ একটা ঝুটোপুটি পড়ে গেল।

সকালে ফল্গুকে তো অবধলাল ডেকে তুলল। ফল্গু বলল, কাল অত চেঁচামেচি সব শুনেছি।

ছাই শুনেছেন! সিদ্ধির সরবত খেয়ে ঘুম মারলেন । কি শুনবেন?

চেঁচামেচি হয়নি?

সব মনে মনে।

ওরা চলে গেছে?

দেখুন না।

ধুলোর ওপর সাত জোড়া ছোট ছোট পায়ের ছাপ। সব বাইরে দিকে বেরিয়ে গেছে।

ছোট ছোট ভূত?

না বাবু। বেচারাদের মতো অভাগা হয় না। মরল তো গিটগিটা। হয়েছিল গিটগিটারা বড় বড় ভূত। কিরকিচার ভয়ে আবার মরে গেল। এখন তো ওরা বিলবিলা। বেঁটে বেঁটে ভূত। কি দুঃখ!

দুঃখ কেন?

আরে বিলবিলা দেখলে গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, সবাই পিটাবে। বিলবিলা হওয়া তো ডর-পোকের লক্ষণ। এক দফে মরলে , ঠিক আছে। আবার ডবল দফে মরবে? ওরা সমাজের কলঙ্ক।

এখন ওরা কি করবে?

পালাবে, আর কি করবে।

আসার আগে অবধলাল খাতে নেমে অনেক খুঁজেও কিছু পেল না। মাহাতোদের বলে, ওহি গাছের নিচে পিতলের ডিব্বায় তামাক পাতা, চুন রেখে দেবে। ভূত তো তাড়িয়ে দিয়েছি। গাছে যে কিরকিচা আছে, তাকে চটাবে না।

ডাকাতির মাল?

নির্ভয়ে খোঁজ গে।

গ্রামের লোক তো পায়ের ছাপ দেখতে গেল। গিরগিটাদের বিলবিলা হবার কথাও শুনল। ওদের কি আনন্দ। মাহাতোরা, সাঁওতালরা, তেলিরা,সবাই যাবে। দরজা, জানালার কপাট নেবে, ইট নেবে। বাগান থেকে কুল, আমলকি, আম নেবে। গাছ কেটে জ্বালানি করবে। ওই মস্ত পুকুরে স্নান করবে। ঘাসবনে গরু চরাবে।

প্রচুর মুরগি কাটা হলো, খুব খাওয়া-দাওয়া। কমলবাবু সবই খেলেন, কিন্তু বললেন, ভূতের ডবল ডেথ, ধুলোতে পায়ের ছাপ, দূর মশাই, সব ধাপ্পা।

অবধলাল বলল, ও সব বলবেন না বাবুজী, তাহলে কিরকিচাটা আপনার পেছনে লেগে যাবে। আপনাকে গিরগিটা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি যা ভিতু হয়তো আবারও মরে যাবেন। তখন বিলবিলা হয়ে থাকতে হবে।

ভাল্লুকেও ভেজাল

স্বপনবুড়ো

একরকম অচেনা শহরে হঠাৎ পেছন থেকে 'পিকলু' বলে ডাকতে শুনে সে হোঁচট খেতে খেতে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর উল্টোদিকে ফিরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে—হাঁকটা আসছে কার কাছ থেকে।

আরে, থপ্‌থপ্‌ করে মূর্তিমান ঘটোৎকচ এগিয়ে আসছে যে!

ঘটোৎকচের আসল নামটা পিকলুরা সবাই যে ঠিক কবে থেকে ভুলে গিয়েছিল—সে কথা আর মাটি খুঁড়ে জানা যাবে না।

এমনিতেই ছেলেটার উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, আর ওই রকম থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটা দেখে সবাই তাকে অন্য রকম মনে করত। তার ওপর যে বছর ইস্কুলে সে ঘটোৎকচের পার্ট নিয়ে বাঁশের তৈরি স্টেজটাকে আচমকা ভেঙে ফেললে, সেই থেকেই তার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটা ছেলের দল একেবারে বেমালুম ভুলে গেল, আর সরাসরি 'ঘটোৎকচ' বলেই তাকে ডাকতে শুরু করে দিল।

ঘটোৎকচ আদৌ তাতে চটত না। ওইটেই যেন তার আসল নাম, এইভাবেই

ছেলেদের কৌতুককে সে সহজভাবে গ্রহণ করেছিল।

মান্ধাতার আমলের সেই ঘটোৎকচ্ ওকে দেখতে পেয়ে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে চাঁদ খুঁজে পেলে! একেবারে লুফে নিলে ওকে— যেমন নাকি পাঠশালার ছেলেরা পাকা পেয়ারা লুফে নেয়। বললে, আরে পিকলু, তুই! এই শহরে এলি কোথা থেকে?

পিকলু উত্তর দিলে, খুব হালে এসেছি। কিন্তু ঘচোৎকচ, এই অজানা শহরে তুই কি করছিস?

ঘটোৎকচ হো-হো করে হাসতে লাগল। বলল, আমাদের আবার জানা-অজানা। আমরা সারা দেশের শহরে শহরে টুঁ মেরে বেড়াই—

পিকলু জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কাজটা কি শুনি?

ঘটোৎকচ তার ছোট চোখ দুটি নাচিয়ে মিটিমিটি হাসল, সে ভারী মজার কাজ। সার্কাসে চাকরি নিয়েছি যে! তাই সব শহরে শহরে আমাদের আনাগোনা, নানান জায়গার জল পড়ছে পেটে। আর সেই সঙ্গে নানান জায়গায় বিচিত্র সব খাবার। যেমন খাবার খাই, আর তেমন জল খাই—! দারুণ খিদে পায় তো! কাজেই সব হজম হয়ে যায়।

কিন্তু সার্কাসে তোর কাজ কি?—পিকলুর অবাক প্রশ্ন।

ঘটোৎকচ উত্তর দেয়, আমার কাজটা ভারী রগড়ের। একটি মোটা ভাল্লুককে নিয়ে খেলা দেখাতে হয়। ভাল্লুকটা কখনো তালে-তালে নাচছে, কখনো মধু খাবার জন্যে আবদার করছে, কখনো কেঁপে জ্বর আসছে তার। আবার পরমুহূর্তেই সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যেন বক্তৃতা দিচ্ছে।

পিকলু উৎসাহিত হয়ে বললে, খুব মজার ব্যাপার তো! আমায় দেখাবি তোদের ভাল্লুকের খেলা?

— দেখাব বৈ কি! সার্কাসের দলে আমার কি রকম খাতির দেখবি! তোকে একেবারে বক্সে বসে দেখাবো। তখন বুঝবি আমার কেরামতিটা! চল, আমাদের ডেরাটা আগে দেখে আসবি।

সত্যি, পেল্লায় কাণ্ড বলতে হবে।

শহরের এক প্রান্তে নদীর ধারে বিরাট তাঁবু পড়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি আরও অনেক তাঁবুও আছে। বড় তাঁবুর ভেতর জানোয়ারগুলো থাকে। আর যারা খেলা দেখায় তারা থাকে ছোট ছোট তাঁবুগুলির ভেতর।

সার্কাস অঞ্চলে ঢুকে ঘটোৎকচের যার সঙ্গেই দেখা হয়, একেবারে দারুণ

হুল্লোড় করে পরিচয় করিয়ে দেয় পিকলুর সঙ্গে। —মেরা দোস্ত আ গিয়া। You See–he is my friend–! দেখো ভাই, আমার ছেলেবেলার বন্ধু—

আনন্দের আতিশয্যে কখনো বলছে হিন্দিতে, কখনো ইংরাজীতে, আবার কখনো বাংলায়।

তারপর পিকলুর কানে কানে কইলে, বুঝলি পিকলু, আজ যা একখানা ভাল্লুকের খেলা দেখাবো—

পিকলু বললে, সে তো বুঝলাম ঘটোৎকচ। কিন্তু তোর সেই মজাদার ভাল্লুকটা কোথায়? সেটা আমাকে আগে দেখা! ভাল কথা, আঁচড়ে-কামড়ে দেবে না তো?

শুনে ঘটোৎকচ হো-হো করে হাসতে লাগল, আমি সঙ্গে রয়েছি, তোর ভয়টা কি শুনি?

দু'জনে গিয়ে হাজির হলো মস্তবড় এক ভাল্লুকের খাঁচার সামনে।

ঘটোৎকচকে দেখে ভাল্লুকটা আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিল।

পিকলু বললে, ভাল্লুকটা তোকে ভারী চেনে দেখছি। দেখেই একেবারে নাচতে শুরু করে দিল।

ঘটোৎকচ বললে, নইলে আর আমার পোষা ভাল্লুক কিসে? জানিস, কথা বললে বোঝে। তুই যদি কিছু খেতে দিস—তাহলে তোর সঙ্গে দিব্যি ভাব হয়ে যাবে।

পিকলু শুনে খুব মজা পেল। বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খেতে দেবো। তোর ভাল্লুক কি খেতে ভালবাসে বল? শুনেছি ভাল্লুক মৌচাকের মধু খেতে খুব ভালবাসে। হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা বইয়েতে পড়েছি —, মহুয়া খেতে ভাল্লুক খুব ভালবাসে

—আরে রেখে দে তোর বইয়ের লেখা।—ঘটোৎকচ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, আমার কাছে সব শুনে নে। আমার ভাল্লুক সব কিছু খেতে ভালবাসে। মানে, তুই যা- যা খেতে ভালবাসিস—সব খাবার।

—বলিস কি? ভাল্লুক সব খাবার খেতে ভালবাসে? কচুরি—সিঙ্গাড়া গরম জিলিপি—সব?

—একেবারে বিলকুল!—ঘটোৎকচ চোখ দুটি নাচিয়ে একেবারে অভিজ্ঞের হাসি হাসতে থাকে। তারপর নিজের ঠোঁট চেটে বলে, একেবারে মানুষের মতো যা দিবি সব গপাগপ খেয়ে নেবে। এতটুকু মুখ বাঁকাবে না।

—আমি তাহলে দোকান থেকে কিছু টাটকা খাবার নিয়ে আসি।—পিকলু খুবই উৎসাহিত।

—হ্যাঁ, একেবারে তিনজনের মতোই আনিস। খাওয়ায় ওর খুব হাতযশ আছে। ঠিক একটা মানুষের মতোই গপাগপ খেয়ে নেবে।

পিকলু এক ঝুড়ি গরমাগরম খাবার যখন নিয়ে এলো, ভাল্লুকটা ঠিক মানুষের মতই আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

পিকলুও মহা উৎসাহে খাবার ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। আর তক্ষুণি পিকলুকে অবাক করে দিয়ে ভাল্লুকটা দুই হাতে কপ্‌কপ্ করে খাবার খেতে লাগল।

পিকলু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, বাঃ! দিব্যি মানুষের মতো খাচ্ছে কিন্তু তোর ভাল্লুকটা।

ঘটোৎকচও কম উৎসাহিত হয়ে উঠল না। বললে, হ্যাঁ, মানুষের মতোই তো! কিরকম টেনিং দিয়েছি আমি! একেবারে মানুষও বলতে পারিস।

হঠাৎ পরিতৃপ্ত ভাল্লুকটা ঢেকুর তুলল। পিকলু চোখ দুটো বড় বড় করে শুধায়, অ্যাঁ তোর ভাল্লুক দেখছি পেট ভরলে মানুষের মতো ঢেকুর তোলে!

একটু বাদে ভাল্লুকটা গলা উঁচিয়ে মানুষের ভাষায় বলে উঠল জল!

পিকলুর চোখে-মুখে পরম বিস্ময়। ঘটোৎকচের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, অ্যাঁ! তোর ভাল্লুকটা দেখছি ঠিক মানুষের মতো কথা বলতে পারে!

ঘটোৎকচ বিজ্ঞের হাসি হেসে উত্তর দিলে, হুঁ হুঁ সব শিখিয়েছি যে!

—বাংলাও শিখিয়েছিস ভাল্লুককে?

ঘটোৎকচ বললে, নয়তো কি! কাজের সুবিধের জন্য কত কিছু করতে হয়।

এইবার ভাল্লুকটা করল কি, সহসা তার মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেললে। কি আশ্চর্য! ভেতরে একটা মানুষের মুখ!

পিকলুর চোখ তখন কপালের ওপর উঠেছে! বললে, অ্যাঁ! ঘটোৎকচ, করেছিস কি? একটা মানুষকে দিব্যি ভাল্লুক সাজিয়ে রেখেছিস?

ঘটোৎকচের মুখে তখনো বিজ্ঞের হাসি! সে বললে, সার্কাস চালাতে গেলে অনেক কিছু করতে হয়। আমাদের পুরানো ভাল্লুকটা মারা গেছে। কিন্তু তাই বলে সার্কাসের খেলা তো বন্ধ থাকতে পারে না। প্ল্যানটা কিন্তু আমারই। দিব্যি মানুষটাকে ভাল্লুকের পোশাক পরিয়ে নিয়ে খেলা জমিয়ে তুলেছি। সার্কাসের ম্যানেজারও আমার কাজ দেখে ভারী খুশী। পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ভাল্লুকের পরিচর্যা করার ঝামেলাটা কমে গেছে। বিশ্বম্ভর আমাদের সঙ্গে বসে দিব্যি ডাল-ভাত খায়!

বিশ্বম্ভর মাথা দুলিয়ে বললে, হ্যাঁ বাবু, বড্ড খিদে পেয়েছিল। তিনজনের খাবার তাই একাই সেরে দিয়েছি। আপনার জয়-জয়কার হোক।

কাণ্ড দেখে পিকলু একেবারে তাজ্জব বনে গেছে।

খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, মাছে আলতা মাখানো এসব ওরা জানে! আর কোনও বইয়েতেও পড়েনি

পিকলু জিজ্ঞেস করলে, এই রকম করে তুমি দিনের পর দিন ভাল্লুক সেজে খেলা দেখাচ্ছ?

বিশ্বম্ভর শুনে হি-হি করে হেসে উঠল। জবাব দিলে, বাবু ঝামেলা তো কিছু নেই! দিব্যি পোশাকটা পরি, আর সন্ধ্যেবেলা ভাল্লুকের নাচ দেখাই। রোজ পাঁচ টাকা করে নগদ পাই। তাছাড়া সার্কাসের হেঁসেল থেকে কোন না দেড়শো টাকার ভাত খাই? আমার দিব্যি পুষিয়ে যায়। আর ভেবে দেখুন বাবু, সার্কাস কোম্পানিরও কত সুবিধে। একটা ভাল্লুক পোষা কি সোজা কথা? হাতি পোষার চাইতেও শক্ত। কথায় কথায় ভাল্লুকের জ্বর সামাল দেবে কে? ভাল্লুকের আঁচড়-কামড় আছে,—তাছাড়া কোথায় মৌচাকের মধু, কোথায় মহুয়ার রস,—এসব যোগান দেবে কে শুনি? বাঘ-সিংহ মাংস পেলেই খুশি। কিন্তু ভাল্লুক তো তা নয়—

পিকলু বললে, তাই বলে ভাল্লুকে ভেজাল?

বিশ্বম্ভর হাসতে হাসতে জবাব দিলে, মানুষ ভাল্লুকের নাচ দেখে দর্শকরা বেশি খুশি—বুঝলেন বাবু?

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প